বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা

আচার্য জগদীশচন্দ্র

১

মণীন্দ্র ঘটক

বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা

আচার্য জগদীশচন্দ্র

মণীন্দ্র ঘটক

পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীমান সুজয়

এবং

তার মা ও বাবাকে

সম্পাদকীয়

যাঁরা বিজ্ঞান-কর্মে ব্রতী, তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে প্রায়শই বিচ্ছিন্ন থাকেন। যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন, যাঁরা ছবি আঁকেন, কিংবা যাঁরা অন্যান্য চারুশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাঁদের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ অনেক প্রত্যক্ষ। বিজ্ঞানীরা সে অর্থে নেপথ্যচারী। তাই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নানান কল্পনা-বিলাস কাজ করে। তাই নিউটনের আবিষ্কারের সঙ্গে একটি পড়ন্ত আপেলের 'ঐশী প্রভাব' ওতপ্রোত হয়ে যায়, কেকুলে-র আবিষ্কারের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে পড়ে তাঁর দেখা একটি স্বপ্ন। বিজ্ঞানীদের জীবনকথার সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় নেই বলেই তাঁরা ভাবেন বড়ো বড়ো আবিষ্কার ও উদ্ভাবন ঘটে যায় দৈব যোগাযোগের ফলে। বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার ও প্রয়োগের পেছনে যে-সব মানুষ সারা জীবন সুখে-দুঃখে বেদনায় অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁদের সাধনার ফল, ইঙ্গিত দিয়েছেন নতুন সম্ভাবনার, সে-সব মানুষের জীবন এবং কৃতি সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতাই এ মনোভাবের জন্য দায়ী। এ অজ্ঞতার জন্যই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানকে দেখে দেবতার দান হিসেবে।

বিজ্ঞান ব্যাপারটাও একান্তভাবে মানবিক। মোনালিসা যেমন কোন দেবতার আঁকা নয়, তাজমহল যেমন দেব-কারিগর বিশ্বকর্মার সৃষ্টি নয়, বিজ্ঞানের কোন ক্রিয়াকৌশলই তেমনি দেবতার হাতে উদ্ভাবিত হয় নি। যাঁরা নিজ হাতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার নানান বিস্ময়কর শক্তিকে মানুষের আয়ত্তে এনেছেন, তাঁদের জীবনকথার সঙ্গে তাঁদের জীবনসাধনাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিজ্ঞানকে জানতে হলে তাই বিজ্ঞানীদেরও চিনে নিতে হয়, তাঁদের জীবন ও কর্মপ্রয়াসের স্বরূপটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে যে মনোভাব সাধারণ্যে কাজ করে বিজ্ঞানীদের সম্পর্কেও স্বাভাবিকভাবেই সে-ধরনের মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায়। তাই বিজ্ঞানীদের জীবনী লিখতে গিয়ে জীবনীকারেরা তাঁদের উপর দেবত্ব আরোপ করেন। তাঁদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পেছনে ঈশ্বরের অদৃশ্য প্রভাব লক্ষ্য করেন। এতে বিজ্ঞানীর সঠিক মূল্যায়ন হয় না। মানুষকে দেবতার আসনে বসালে তার গৌরব বাড়ে বলে আমরা মনে করি না।

বিজ্ঞানীরাও যে মর্ত্যবাসী, তাঁরাও যে পৃথিবীর ধূলো-মাটির উপরই জীবন যাপন করেছেন, একথা মনে রেখেই বিজ্ঞানীর জীবন ও বিজ্ঞান-সাধনার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হয়। 'বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা'য় আমরা তাই করেছি। দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের জীবনের পটভূমিতে তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদানের কথা যথাযথভাবে এবং প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশের চেষ্টাই হলো আমাদের উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানীরা কোন্ পটভূমিতে তাঁদের গবেষণার কাজ করেছেন, তাঁদের কর্ম-প্রয়াসে কোন্ কোন্ সমস্যা দেখা দিয়েছে, কীভাবে তাঁরা সে-সব সমস্যার সমাধান করেছেন সেসব কথা জানতে পারলে পাঠকেরা অনুধাবন করতে পারবেন যে, বিজ্ঞান-সৌধের ইট-পাথরও মানুষের স্বেদসিক্ত ; অনুধাবন করতে পারবেন যে, বিজ্ঞানও একান্তভাবেই শ্রমলব্ধ। 'বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা' পড়ে পাঠকেরা যদি এ সত্যের ইঙ্গিত পান, তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

এ গ্রন্থমালার পরিকল্পনার পেছনে আছে 'পুথিপত্র' প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহার উৎসাহ এবং আগ্রহ। তিনি সাগ্রহে এগিয়ে না এলে এ গ্রন্থমালার রূপায়ণ সম্ভবপর হতো না। আমাদের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীদিবাকর সেন, শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীঅনীশ দেব, শ্রীজয়ন্ত স্থাণুপতি, শ্রীঅসীম চক্রবর্তী, শ্রীঅরিজিৎ বসুরায়। এ গ্রন্থমালার রূপ-সজ্জার ভার নিয়েছেন শ্রীসিদ্ধার্থ হোম এবং শ্রীশিশির ব্যাপারী। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। 'বিজ্ঞান-মনীষা গ্রন্থমালা'-র বইগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশের ব্যাপারে যাঁরা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীস্বদেশ ঘোষ, শ্রীতাপস সাহা এবং শ্রীসুমোহন আচার্য। তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ রইলাম।

আমাদের সব রকম সতর্কতা সত্ত্বেও হয়তো এ গ্রন্থমালায় নানান ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে। এ ব্যাপারে পাঠকদের মতামতকে আমরা খুবই মূল্যবান মনে করি। এ গ্রন্থমালার উৎকর্ষ বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁদের মতামত ও পরামর্শ ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

অজয় চক্রবর্তী
মণীন্দ্র ঘটক

জীবন-বৃত্তান্ত

ছেলেবেলা

জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত-সর্দার। তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, কেউ তার কাছ ঘেঁষে না। ফরিদপুরের বাঘা হাকিম ভগবানচন্দ্র বসুর কাছে এসে ধরনা দিলে সেই ডাকাত-সর্দার। ভগবানচন্দ্র তার কথা শুনলেন সব। দেখলেন, এক সময়ে ডাকাতি করলেও এখন সে অক্ষম, বুড়ো হয়েছে। সমাজে তাকে ঠাঁই দেবে না কেউ। সারাজীবন ডাকাতি করেছে, জেল খেটেছে। ঘর-সংসার কিছু নেই। সত্যি তো, তার কি হবে, কি করে বেঁচে থাকবে মানুষটা? ভেবে-চিন্তে তাঁর ছেলে জগদীশচন্দ্রের দেখা-শোনার জন্যে নিয়োগ করলেন ডাকাত-সর্দারকে।

ভগবানচন্দ্রের কাণ্ড দেখে সবাই থ। ডাকাতের হাতে নিজের ছেলের দায়িত্ব দিতে পারে যে বাপ, তাকেও তো ডাকাত ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। কিন্তু ভগবানচন্দ্র তখনকার দিনের হাকিম হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত, দেশ-সেবক রূপে তেমনি খ্যাতিমান। ফরিদপুরে স্বদেশী-ভাবধারা প্রবর্তনের জন্যে কত কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। মেলা, প্রদর্শনী, কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, স্বদেশী-শিক্ষার প্রসার—এসব কাজে ভগবানচন্দ্রের উদ্যোগ দেশে তখন সাড়া তুলেছে। তাঁর কোনও সিদ্ধান্তকে নেহাৎ খেয়াল-খুশি বলে ভাবা যায় না। ডাকাতের হাতে ছেলের দেখা-শোনার ভার দেবার কথা ভাবতে গা শিউরে ওঠার কথা ঠিকই। কিন্তু ভগবানচন্দ্র সত্যি ডাকাত-বাপ ছিলেন না। তাঁর এ সিদ্ধান্তের মূলে ছিল মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভালবাসা।

ছেলেও বাপের এই গুণটি পেয়েছিলেন যথাযথ। মানুষের প্রতি ভালবাসা আর বিশ্বাসের এক ব্যাপক প্রতিফলন দেখা যায় জগদীশ-চন্দ্রের পরিণত জীবনে। তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে মানবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখা যায় নি তাঁকে।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম আজকের বাংলাদেশ আর তখনকার পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ শহরে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতে শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ—ঐতিহাসিকেরা বলেন, সিপাহীদের এই বিদ্রোহই হল ভারতকে ইংরেজ কবল থেকে মুক্ত করার সংগ্রামের প্রথম সূত্রপাত। এই বিদ্রোহ চলে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। সারা ভারতে জ্বলছে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন, সেই সময়ে, বিদ্রোহের মধ্যলগ্নে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। বড় হয়ে সে-গল্প শোনেন তাঁর মায়ের কাছে। বিদ্রোহের হাওয়ায় যে শিশুর জন্ম, পরবর্তী কালে তাঁর পরিণত ব্যক্তিত্বে অন্যায় এবং অবমাননার বিরুদ্ধে রোষ আর প্রতিবাদ ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক, উঠেও ছিল—সে কাহিনী অনেক পরে। মনে হয়, জন্মলগ্নে যে বাতাসে শ্বাস টেনেছিলেন প্রথম, বড় হয়ে তাই হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রেরণা।
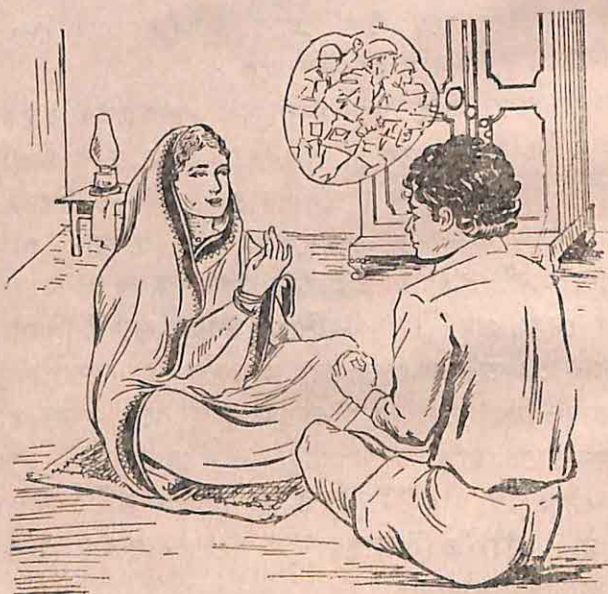
বড় হয়ে সে গল্প শোনেন তাঁর মায়ের কাছে

তাঁর বাবা ময়মনসিংহ শহরের ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আদর্শবান দৃঢ়চেতা মানুষ। অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে ছেলেবেলা থেকে।

নানা দুঃখকষ্টের মধ্যে পড়েও তাঁর মানুষ হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা টলে নি কখনও। ময়মনসিংহে তিনি শুধু একজন স্কুল-শিক্ষক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী রূপেও তখন তাঁর খ্যাতি। সেখানে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে। সেই সূত্রে চলে নানা সমাজসেবা ও সংস্কারের প্রচেষ্টা।

জগদীশচন্দ্রের জন্মের তিন-চার বছর পরে তাঁর বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে চলে আসেন ফরিদপুর শহরে। দশ বছর বয়স পর্যন্ত এখানেই কেটেছে জগদীশচন্দ্রের। শিশু থেকে বালক হয়ে উঠেছেন এখানেই। ফরিদপুর শহরের দিনগুলি তাই তাঁর পরিণত জীবনের ভিত বলা যায়।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সময় তখন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্মচেতনা এবং রাজনীতিতে তখন চলছে নয়া চিন্তা-ভাবনা, নবীনদের জাগরণ। একদিকে স্বদেশ-ভাবনার প্রবাহ, অন্য দিকে বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষার জোয়ার। ইংরেজি স্কুল গড়ে উঠেছে দেশের শহরে শহরে। সমাজের বিত্তশালী অংশ ইংরেজের অনুকরণে মত্ত। জগদীশচন্দ্রের বাবার তাতে কোনও শ্রদ্ধা নেই। ছেলের পাঁচ বছর বয়স হতে না হতেই তিনি তাঁকে ভর্তি করে দিলেন ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে। এই বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি নিজে। সেখানে পড়ুয়া ছিল সমাজের যত নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র মানুষের ছেলেরা।

এও এক অবাক কাণ্ড। হাকিমের ছেলে পড়াশোনা করবে ইংরেজি স্কুলে, সমাজের নিম্নস্তরের সঙ্গে থাকবে না কোনও বন্ধন—একদিন তাকেও তো হতে হবে হাকিম বা পুলিশ সাহেব বা ব্যারিস্টার, অথবা অন্য কিছু, বাংলা স্কুলে লেখা-পড়া শিখে তা কি হবার জো আছে? পিতা ভগবানচন্দ্র যেন এসব কিছু বুঝতে চান না। তিনি ছেলেকে পড়াবেন বাংলা স্কুলে। ছেলের দেখাশোনার ভার দিয়েছেন এক জেল-ফেরত বৃদ্ধ ডাকাতের হাতে। তাঁর নিজের সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের ছেলেপুলেরা যখন শিখছে কি করে ইংরেজি সঠিক উচ্চারণ করতে হয়, কি করে হাঁটা-চলা করতে হয় সাহেবদের মতো, তখন তাঁর ছেলে জগদীশচন্দ্র শুনছেন তাঁর সঙ্গী পড়ুয়া জেলের ছেলের দারিদ্র্য-দুর্দশার কাহিনী, তাঁর বাবার মুসলমান চাপরাশির

ছেলের কাছে শুনছেন গ্রামজীবনের গল্প, ডাকাত সর্দারের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে শুনছেন দুর্ধর্ষ ডাকাতির বিবরণ।

স্কুলের বাইরে আর একটা বড় শিক্ষা চলছিল বালক জগদীশ-চন্দ্রের। তাঁর বাবা ফরিদপুরে স্বদেশী মেলার প্রবর্তন করেন। এই মেলায় গ্রাম-বাংলার মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং উৎসবানুষ্ঠানের ব্যাপক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হত। বাংলার কুটিরশিল্প থেকে শুরু করে যাত্রা-পাঁচালী-কবিগান ইত্যাদির আয়োজন হত এখানে। বালক জগদীশ এসব দেখেছেন বছরের পর বছর। দেশের সত্যি-কারের সম্পদ বলতে কী বোঝায়, তা তাঁর সরল বাল্যচেতনায় মুদ্রিত হয়েছে খুব সহজে। এই মেলায় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে যাত্রাগান, কথকতা এসব হত। বালক জগদীশ সেসব শুনতেন, মুগ্ধ হতেন। এই দুই মহাকাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি তাঁর মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে যাত্রাগান

ভগবানচন্দ্র তাঁর বাংলোতে নানারকম জীবজন্তু এবং পাখি পুষতেন। এসব প্রাণীদের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার খেলা চলত রোজ। জগদীশচন্দ্র তাই শিশুকালেই খুব সহজে পরিচিত হয়েছিলেন প্রাণী-জগতের সঙ্গে। পশু-পাখি, পোকা-মাকড়, গাছপালা, লতাগুল্ম এসবের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কেটেছে তাঁর ছেলেবেলা।

পাঁচ বছর বয়সে এক টাট্টু ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন জগদীশ। সে সময়ে ফরিদপুরে এক ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হয়েছিল। টাট্টু ঘোড়ায় চেপে জগদীশচন্দ্রও সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে একজন দর্শক। কে তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, তুমিও দৌড়বে নাকি? ব্যস, আর কথা নেই। দক্ষ প্রতিযোগী ঘোড়সওয়ারদের পেছনে জগদীশও ছোটালেন তাঁর টাট্টু ঘোড়া। সারা মাঠের দর্শক বালকের দুঃসাহস দেখে উচ্ছ্বসিত।
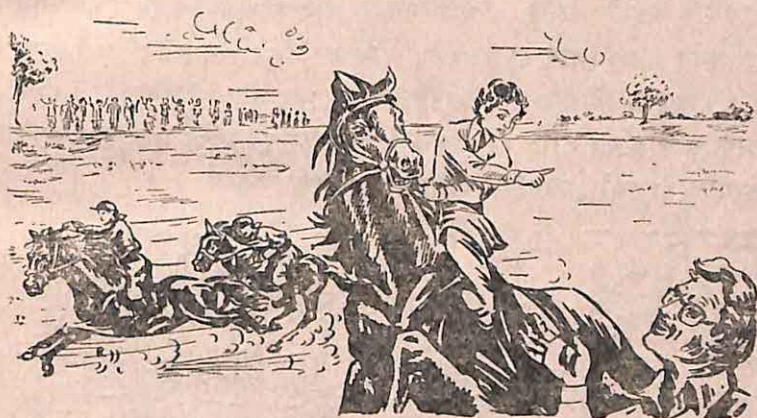
ঘোড়সওয়ারদের পেছনে জগদীশ

ছেলে যাতে পড়াশোনায় অমনোযোগী না হয় পিতার কড়া নজর সেদিকে। হাজারো কাজের মাঝেও রোজ সন্ধ্যায় পড়াশোনার তদারকী করেন ভগবানচন্দ্র। শিশু জগদীশের অসীম কৌতূহল। তাঁর হাজারো জিজ্ঞাসার জবাব দিতে হয় পিতাকে ধৈর্যের সঙ্গে। রাতের অন্ধকার ঝোপের দিকে তাকিয়ে ছেলে জানতে চায়, আগুন জ্বলছে কেন? বাবা হেসে জবাব দেন, আগুন নয়, জোনাকির আলো। জোনাকি এক রকম পোকা, প্রাণী।

কলকাতা: ছাত্রজীবন

ফরিদপুরের দিনগুলি এভাবেই কেটেছে তাঁর। পিতা ভগবানচন্দ্র বদলী হলেন বর্ধমানে ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে। জগদীশচন্দ্রের বয়স তখন দশ বছর। কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা হল। ভর্তি করা হল হেয়ার স্কুলে। হেয়ার স্কুল থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের নামডাক তখন

অনেক বেশি। তিন মাস বাদে সেণ্ট জেভিয়ার্সেই নিয়ে আসা হল জগদীশচন্দ্রকে।

বালক জগদীশের থাকার জায়গা হল কলকাতার মির্জাপুরে ব্রাহ্ম ছাত্রাবাসে। সেখানে তখনকার দিনের সেরা ছেলেরা থেকে পড়াশোনা করে। তারা সবাই জগদীশের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বালক জগদীশচন্দ্র বড় একা। তাঁর এই একা থাকার অবকাশে ছাত্রাবাসের উঠানে এক বাগান গড়ে তুললেন। পুষতে থাকলেন কয়েকটি ছোট প্রাণী। মুগ্ধ বিস্ময়ে বালক জগদীশ দেখতেন তাঁর বাগানের গাছপালার বেড়ে ওঠা, স্বলজ্জ কুঁড়ির প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে ওঠা, দেখতেন তাঁর পোষা প্রাণীদের স্বভাবের সমান বৈশিষ্ট্য। এসব প্রাণী ও উদ্ভিদের সান্নিধ্যে বালক জগদীশচন্দ্রের মধ্যে লুক্কায়িত ভাবী প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যেন তাঁর স্বরাজ্যের সন্ধান পেতেন।

দমবার ছেলে নয় জগদীশ। লেগে গেলেন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের প্রথম দিনের ক্লাশ শেষ। ক্লাশের ছেলেরা ছেঁকে ধরেছে জগদীশকে। কলকাতা শহরের চালাক-চতুর পাকা ছেলের দল তাদের এই গ্রাম্য নয়া সহপাঠীকে নাকাল করবে এই হল মতলব। তারা বললে, ক্লাশের সেরা লড়িয়ে সহপাঠীর সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হবে। দমবার ছেলে নয় জগদীশ। লেগে গেলেন। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি ঘুষোঘুষির শেষে ক্লাশের সেরা

লড়িয়েকে ধরাশায়ী করে ক্ষতবিক্ষত জগদীশচন্দ্র উঠে দাঁড়ালেন। সহপাঠীরা সবাই স্তব্ধ। তাঁরা ভাবে নি জগদীশের কাছেই নাকাল হতে হবে তাদের।

বাবা-মা-ভাই-বোনেরা বর্ধমানে। স্কুলের ছুটি-ছাটায় বালক জগদীশ যান সেখানে। তাঁদের আবাসেও বাবা আর ভাই-বোনেরা পায়রা, খরগোস পোষেন। জগদীশ এসে তাদের পরিচর্যা করেন, তাদের জন্যে ঘর বানান, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, চলাফেরার জন্যে নতুন নতুন সব পরিকল্পনা চলে বালকের মনে।

ছুটি ফুরায়। কলকাতার ছাত্রাবাসে চলে আসেন। সেখানে পড়া-শোনা, স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রাবাসে তাঁর নিজের বাগান, নিজের ক্ষুদে চিড়িয়াখানা নিয়ে সময় কাটে।

নিজের বাগান, নিজের চিড়িয়াখানা নিয়ে সময় কাটে

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ষোল বছর বয়সে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র।

তারপরে শুরু করলেন বিজ্ঞান-বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ বিভাগে প্রবেশ করলেন জগদীশচন্দ্র। সেখানে বিজ্ঞান-বিষয়ে শিক্ষা-দীক্ষার এক সুন্দর পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল পদার্থবিজ্ঞানের নাম করা অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর অধ্যাপনার গুণে। এই অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসে বিজ্ঞানে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগতে আরম্ভ করে জগদীশচন্দ্রের। ফাদার লাফোঁ ছিলেন বিজ্ঞান-

গত প্রাণ। তিনি কেবল ছাত্রদেরই বিজ্ঞান পড়াতেন না, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহযোগে জনসাধারণের মধ্যেও বক্তৃতা দিতেন বিজ্ঞান নিয়ে। ছাত্র থেকে শুরু করে যাতে সাধারণ মানুষও বিজ্ঞান-চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে সে দিকে আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল এই অধ্যাপকের। জগদীশচন্দ্রের মনে তাঁর এই বিজ্ঞান-শিক্ষকের প্রভাব পড়ে অতি সহজে। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্র যখন বিজ্ঞান-জগতের অবিস্মরণীয় প্রতিভা বলে স্বীকৃত তখন তাঁর নিজের আবিষ্কার পরীক্ষা সহযোগে প্রদর্শন করতে দেখা গেছে তাঁকে সাধারণ জনসভায়। মনে হয়, ফাদার লাফোঁর প্রক্রিয়াটি আদর্শ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ছাত্র জগদীশচন্দ্র।

১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষা পাশ করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই বি. এ. পড়া শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পাশ করলেন। কিন্তু এফ. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তাই বলে, তাঁর সম্পর্কে ফাদার লাফোঁর ধারণা পালটায় নি। তিনি তাঁর এই ছাত্রটির মধ্যে যে বিজ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছিলেন, তা তো কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দিয়ে বিচার করা যায় না।

বি. এ. পড়ার সময় জগদীশচন্দ্র তাঁর এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে তাদের আসামের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলেন। ছেলেবেলায় বন্দুক ছোঁড়া শিখেছিলেন। সেই থেকে শিকারের সখ। বন্ধুর সঙ্গে আসামের জঙ্গলে শিকার করার রোমাঞ্চ তাঁকে পেয়ে বসে। সে সময়ে কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেশ অসুস্থ হয়ে ফিরে আসেন কলকাতা। তাতে পড়াশোনারও ক্ষতি হয়েছিল খুব। হয়তো বা সে জন্যেই তাঁর বি. এ. পরীক্ষার ফল আশা করার মতো হতে পারে নি।

এ সময়ে তাঁদের পারিবারিক জীবনে চলছিল নানান দুর্বিপাক। জগদীশচন্দ্রের বাবা অসুস্থ হয়ে কিছুকাল ধরে কর্ম-বিরতিতে আছেন। বাজারে তাঁর ধার-দেনা প্রচুর। দেশসেবার কাজে নিজের যথাসর্বস্ব তো গেছেই, তার ওপরে ধার-দেনা। এসব মিলিয়ে তখন এক বিষণ্ণতা ও অসহায় অবস্থা গ্রাস করেছে পরিবারের সবাইকে।

জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা ইংল্যাণ্ড যাবেন। আই. সি. এস. হয়ে দেশে ফিরে সরকারী উচ্চপদ পেলে পারিবারিক অর্থসংকট দূর হবে। পিতার তাতে অমত। তিনি নিজে ভুক্তভোগী। সরকারী উচ্চ পদে থেকে মানুষের জন্যে মানুষের মতো কাজকর্মে নানা বিঘ্ন। কিন্তু
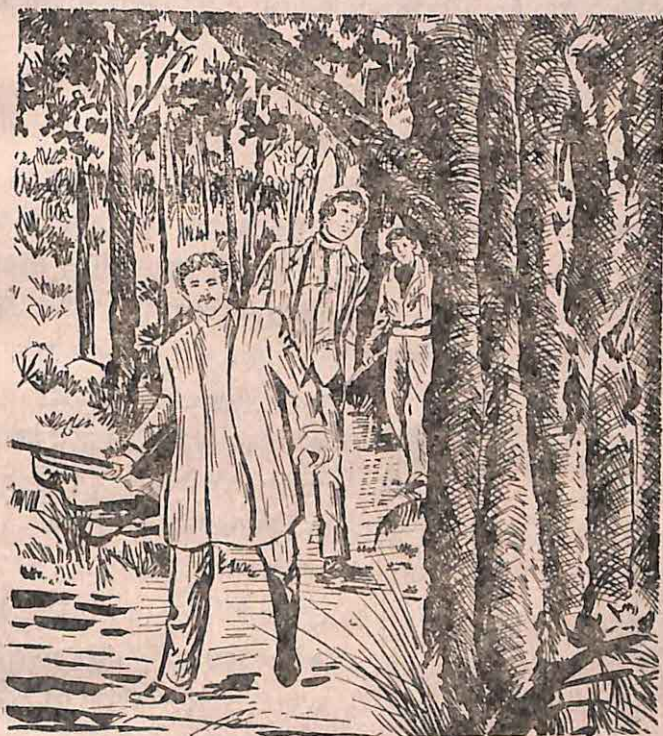
বন্ধুর সঙ্গে আসামের জঙ্গলে

বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে গেলে তাঁর অমত নেই। অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন, বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এসে দেশে বিজ্ঞান চর্চা করবেন। কিন্তু পারিবারিক সঙ্কট তাঁকে ভাবনায় ফেলল। তা ছাড়া, মায়ের ইচ্ছা নয় ছেলে তাঁর কাছ ছাড়া হোক। একটি সন্তান হারানোর সন্তাপ রয়েছে মায়ের মনে। ভগবানচন্দ্রের দুই ছেলে, পাঁচ মেয়ে। জগদীশ বড় ছেলে। ছোটটি অল্প বয়সে মারা যায়। মায়ের মনে অষ্টপ্রহর জেগে আছে সেই সন্তান হারানোর বেদনা। তাই এ ছেলেও দূর বিদেশে গিয়ে চোখের আড়ালে

থাকবে, কেমন থাকবে, কি হয় না-হয় এই সাত-পাঁচ ভাবনায় মায়ের মন ব্যাকুল।

সব দিক বিবেচনা করে জগদীশচন্দ্র বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। দেশেই একটা ভদ্র মতো চাকরি জুটিয়ে পিতার পাশে দাঁড়াবেন। তাতে তাঁর পিতার ভার কিছুটা কমবে। আর পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা ফিরে আসবে মনে হল তাঁর।

জগদীশচন্দ্রের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ঢাকা-বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিক্রমপুর প্রাচীনকাল থেকে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-গরিমায় এ অঞ্চল বরাবরই ছিল অগ্রগামী। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মচর্চার অন্যতম প্রধান পীঠস্থান বলা যায় এই অঞ্চলকে। বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান ছিলেন বিক্রমপুরের এক রাজপরিবারের সন্তান। ঐতিহাসিক কারণেই এ অঞ্চলে বহু অভিজাত বংশের বসতি ছিল বহুকাল ধরে। জগদীশচন্দ্রও এ অঞ্চলের এক অভিজাত বসু পরিবারের সন্তান। ছেলেবেলা থেকে তিনি সে আভিজাত্যের অকৃত্রিম রূপ দেখেছেন তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে। হাজারো দুঃখ-কষ্ট হাজারো বাধা-বিপত্তির মধ্যেও পিতাকে দেখেছেন অটল। পিতার প্রতি ধীরে ধীরে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আর সহযোগী মনোভাব গড়ে উঠেছে দিনে দিনে। পিতাকে ফরিদপুরে দেখেছেন কর্তব্যবোধসম্পন্ন দৃঢ়চেতা উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মীরূপে, আবার নিবেদিতপ্রাণ দেশসেবকরূপে।

ভগবানচন্দ্র বসু

দেশের সেবায় তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর ত্যাগ জগদীশচন্দ্রকে উদ্বোধিত করেছে শিশুকাল থেকে। পিতার বর্তমান অসুস্থতা এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূলেও তাঁর সে চরিত্র। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে

বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ লাগে। ভগবানচন্দ্র তখন বর্ধমান-কাটোয়ার ম্যাজিস্ট্রেট। একদিকে সরকারী উচ্চপদের দায়িত্ব, অপরদিকে দেশসেবকের অনুভূতি একযোগে এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে নিয়োজিত করল ভগবানচন্দ্রকে। তার আগে একবার বর্ধমানে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় মহামারীরূপে। তখনও জগদীশচন্দ্র দেখেছেন, তাঁর পিতা দিন-রাত মহামারী প্রতিরোধে উদ্দাম, নিরলস কর্মব্যস্ত।

এসব কারণে ভগবানচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। তিনি কিছুকালের জন্য অর্ধেক বেতনে ছুটিতে থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে পারিবারিক ব্যয় বহন করাই ছিল কষ্টসাধ্য। তার ওপরে যদি ছেলের বিলেতে থেকে লেখাপড়ার ব্যয় বহনের কথা আসে তো তাঁর পক্ষে সুস্থ হয়ে ওঠাই হয়তো দায় হবে। তাই জগদীশ-চন্দ্র তাঁর বিলেতে গিয়ে পড়াশোনার কথা ভাবা প্রায় ছেড়েই দিলেন।

সে সময়ে একদিন তাঁর মা তাঁকে ডেকে বললেন, তাঁর সামান্য কিছু টাকা আছে। আর গয়না-গাটি বিক্রি করেও কিছু টাকা হবে। এই নিয়ে জগদীশচন্দ্র যেন বিলেত যান।

মায়ের এই আকস্মিক মনপরিবর্তনে জগদীশচন্দ্রকে আবার নতুন করে সব ভাবতে হল। পিতার সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন, বিলেতে গিয়ে ডাক্তারী পড়বেন। ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে এলে স্বাধীনভাবে দেশসেবাও হবে, অর্থ উপার্জনের জন্যেও ভাবতে হবে না। ভগবানচন্দ্রের এতে অমত তো হলই না, বরঞ্চ তিনি খুশিই হলেন মনে মনে। আর জগদীশচন্দ্র তো চোখের ওপর দেখেছেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত, মহামারী পীড়িত তাঁর দেশের জনগণের অবস্থা। ডাক্তারের অভাবে অচিকিৎসায় হাজার হাজার মানুষ মরে। অনাহারে অর্ধাহারে হাজার হাজার মানুষের রোগ হয়। তার কোনও প্রতিরোধ নেই, প্রতিকারের জন্যে কেউ এসে কারো পাশে দাঁড়ায় না।

ইতিমধ্যে ভগবানচন্দ্র কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠে চাকরিতে যোগ দিলেন। তাতে আর্থিক দুর্ভাবনা দূর হল। বিলেত যাবার খরচার জন্যে মায়ের টাকা বা গয়না নিতে হল না জগদীশচন্দ্রকে। পিতাই সে ভার নিলেন অনায়াসে।

বিলাত-যাত্রা

১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ। জগদীশচন্দ্র বাইশ বছর বয়েসের যুবক। পিতার দেশসেবা এবং মর্যাদাবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত পুত্র ডাক্তারি পড়তে পাড়ি দিলেন সমুদ্র। ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরবেন, দেশের মানুষের রোগমুক্তির স্বেচ্ছাব্রতী হবেন—এসব স্বপ্নে তাঁর যুবামানস উদ্বেলিত। কিন্তু সমুদ্র-পথে জাহাজে তাঁর জ্বর এল—আসাম থেকে নিয়ে আসা সেই কালাজ্বর। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে সহযাত্রীদের ভয় হল, না জানি মাঝপথেই যাত্রা স্থগিত রাখতে হয় জগদীশচন্দ্রকে। তা হল না বটে, জ্বর ছাড়ল কিন্তু অসুস্থ অবস্থাতেই নেহাৎ মনের জোরেই লণ্ডনে পৌঁছলেন জগদীশচন্দ্র।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হবার পরীক্ষায় সহজেই পাশ করলেন জগদীশচন্দ্র। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণী-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—এইসব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে বেগ পেতে হয় নি তাঁকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্ররূপে ভর্তি হলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হাসপাতালে। সেখানে শারীর-বিজ্ঞানের ক্লাশ করতে গিয়ে বিপদে পড়লেন জগদীশচন্দ্র। একে তো সেই জ্বরের প্রকোপে দুর্বল স্বাস্থ্য, তার ওপরে শারীর-বিজ্ঞানের ক্লাশে শব-ব্যবচ্ছেদ ইত্যাদি নানা ধরনের শরীর-বিষয়ক ক্লাশের অসহ পরিবেশ তাঁর পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে উঠল। তা ছাড়া, এ সময়ে মাঝে মাঝে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হতে থাকায় পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল। শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বললেন, অসুস্থ শরীরে তাঁর পক্ষে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতো খাটাখাটুনীর ক্লাশ করা সম্ভব হবে না। অন্য কোনও বিষয়ে পড়াশোনা করাই ঠিক তাঁর পক্ষে। সে হাসপাতালের খ্যাতিমান চিকিৎসক ডক্টর রিঙ্গার তাঁকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করেও সারাতে পারলেন না। তিনিও বললেন, জগদীশচন্দ্রের পক্ষে বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিষয় নেওয়াই ভাল।

এ সময়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানে একটি বৃত্তি পেয়ে জগদীশচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট কলেজে চলে এলেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই এক বছর এখানে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ নেন। পরের বছরের মাঝামাঝি

সময়ে কেবল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করবেন স্থির করলেন।

কেম্ব্রিজের পরিবেশে এসে ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হতে থাকলেন। ওষুধপত্র খাওয়া ছেড়ে দিলেন। অধ্যাপকদের পরামর্শে ব্যায়ামচর্চা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জগদীশচন্দ্র

এখানে কলেজ জীবনে সতীর্থদের সঙ্গে জগদীশ-চন্দ্রের হৃদ্যতা গড়ে উঠল খুব সহজে। তিনি ছিলেন কিছুটা মুখচোরা লাজুক স্বভাবের। কিন্তু কেম্ব্রিজের পরিবেশে তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে নি। এখানকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানের সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা বক্তৃতা বিতর্ক হত নিয়মিত। আর তার মাধ্যমে সতীর্থ এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল জগদীশচন্দ্রের। বিদেশে সতীর্থদের সঙ্গে প্রথম গ্রীষ্মের ছুটি কাটালেন ওয়াইট দ্বীপে। সেখানে নৌকা চালাতে গিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে ঝড়ের মধ্যে পড়ে অর্জন করেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার পরের গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে তখনকার বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপকদের সংস্পর্শে আসেন জগদীশচন্দ্র। শারীর-বিজ্ঞানে মাইকেল ফস্টার, ভূ-তত্ত্বে হিউয়েজ এবং ভ্রূণবিদ্যায় ফ্রানসিস ব্যালফোর-এর বক্তৃতা শুনে অভিভূত হতেন তিনি। অধ্যাপক লর্ড র‍্যালি পড়াতেন পদার্থবিদ্যা আর সিডনি ভাইনস্ পড়াতেন উদ্ভিদবিদ্যা। কলকাতার ছাত্রজীবনে ফাদার লাফোঁ যেমন জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-বিষয়ে স্বতন্ত্র চেতনা লক্ষ্য করেছিলেন, কেম্ব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমনি এই অধ্যাপক দু'জনও দেখেছিলেন তাঁদের এই বিদেশী ছাত্রটির ভেতরে বিশেষ একটি অন্বেষণের আগ্রহ। তাই তাঁদের বড় প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠেছিলেন জগদীশচন্দ্র। পরবর্তী কালে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনায় এঁরা তাঁদের এই প্রিয় ছাত্রটিকে সুযোগ-সুবিধা-সহযোগিতা দিয়ে তাঁর প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিলেন নানাভাবে। এখানেই উদ্ভিদ-শারীর বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ফ্রান্সিস ডারউইন-এর সংস্পর্শেও এসেছিলেন জগদীশচন্দ্র।

প্রবাসে চার বছরের ছাত্রজীবন শেষ হল ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং উদ্ভিদ-বিদ্যায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন জগদীশচন্দ্র। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস্‌সি. ডিগ্রীও এ সময়ে পান তিনি। এবার দেশে ফেরার পালা।

স্বদেশে ঃ অধ্যাপনা

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দেই দেশে ফিরে এলেন। তাঁর ভগ্নীপতি আনন্দ মোহন বসুর বন্ধু অধ্যাপক ফসেট তখন লণ্ডনে ব্রিটিশ পোস্টমাস্টার জেনারেল। ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের নামে তিনি জগদীশচন্দ্রের একখানা পরিচয়-পত্র লিখে দেন। আনন্দমোহন বসু তখন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, প্রথম ভারতীয় র‍্যাঙলার। পরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। আর অধ্যাপক ফসেট তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। লণ্ডনেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় জগদীশচন্দ্রের।

দেশে ফিরে অধ্যাপক ফসেটের চিঠি নিয়ে সিমলায় গিয়ে দেখা করলেন লর্ড রিপনের সঙ্গে। লর্ড রিপন তাঁর পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি কথা দিলেন, ভারতের শিক্ষাবিভাগে তাঁর জন্যে একটি উচ্চ পদের ব্যবস্থা করবেন। বাংলা সরকারকেও চিঠি দিলেন। বাংলা সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট ভারতীয়দের সম্পর্কে বিরূপ ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের যোগ্যতা কোনও ভারতীয়ের পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারতের শিক্ষাবিভাগে কোনও শূন্যপদ নেই, এই অজুহাতে জগদীচন্দ্রকে প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগে একটি পদ গ্রহণের প্রস্তাব দেন। জগদীশচন্দ্র তা প্রত্যাখ্যান

করেন। কিছুদিন বাদে ব্যাপারটা লর্ড রিপনের নজরে আসে। তখন তিনি নিজেই এ ব্যাপারে হাত দেন। ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের অধীনে জগদীশচন্দ্রকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা হল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ সি. এইচ. টনির অবশ্য এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল।
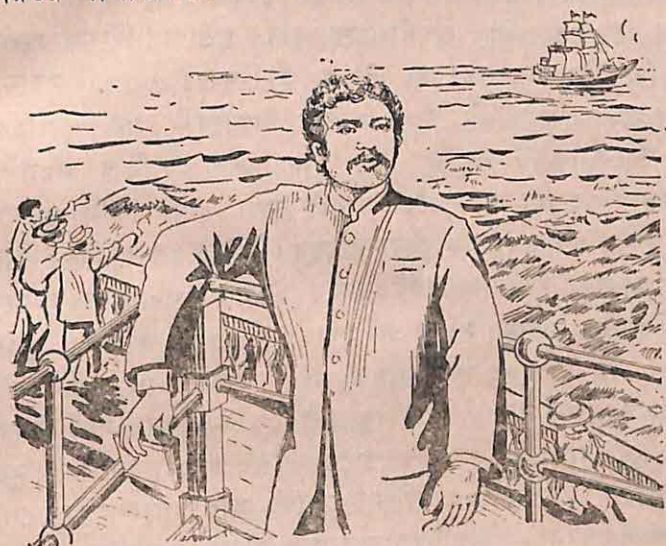
দেশে ফিরে এলেন জগদীশচন্দ্র

অধ্যাপনায় যোগ দিয়ে একটি ধাক্কা খেতে হল। সরকারী ব্যবস্থাপনা এমন ভাবে তৈরী যে, দেশের মানুষ তার আওতায় এলেই হাড়ে হাড়ে টের পায় তারা স্বাধীন জাতি নয়, পরাধীন। জগদীশচন্দ্রও টের পেলেন। সে সময়ে একই সরকারী পদে ইউরোপীয় হলে যে মাইনে হত, ভারতীয়রা পেত তার তিন ভাগের দু'ভাগ। জগদীশচন্দ্রের বেলায় তা আবার আরও কম হল। কারণ তিনি নিযুক্ত হয়েছেন অস্থায়ী পদে। সাহেবদের নিয়মমতো তাঁর মাইনে হবে ভারতীয়দের স্থায়ী পদের নির্ধারিত বেতনের অর্ধেক। জগদীশচন্দ্র এ বৈষম্যের রীতি মানতে পারলেন না। প্রতিবাদ-পত্র লিখলেন। কোনও সাড়া পেলেন না। প্রতিমাসে বেতন প্রত্যাখ্যান করে তিনি অধ্যাপনা করে যেতে লাগলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন খুব দুর্নাম। ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে রেষারেষি, মতবিরোধ। জগদীশচন্দ্র লিখেছেন, "উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্বিনীত বলে এই কলেজের ছাত্রদের সম্বন্ধে তখন বেশ অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কলেজের দুজন অধ্যাপক ও ছাত্রমহলের বিরোধ এতটা সাংঘাতিক হয়ে উঠেছিল যে, সরকার এক তদন্ত কমিশন বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন।" এ অবস্থা কোনও নতুন অধ্যাপকের অনুকূল হতে পারে না। জগদীশচন্দ্র অত্যন্ত দুর্ভাবনা নিয়েই কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে কী ভাবে নেবে, সহযোগী অধ্যাপকদের সঙ্গে কী রকম সম্পর্ক দাঁড়াবে—এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তাঁকে কিছুটা সঙ্কুচিত করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু অধ্যাপনা শুরু করার পর খুব কম সময়ের মধ্যেই দেখা গেল তিনি ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। তাঁর অধ্যাপনার রীতি-প্রকৃতি ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। পদার্থবিদ্যার মতো শক্ত বিষয়ও হয়ে উঠল সহজ এবং বোধগম্য। শুধু তাই নয়, ক্লাশে ছাত্রদের নাম ডাকারও দরকার হত না। তাঁর ক্লাশে কোন ছাত্র অনুপস্থিত থাকত না। পদার্থবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে বিষয়টি এমন ভাবে বোঝাতেন জগদীশচন্দ্র যে ক্লাশেই ছাত্ররা সহজে সব বুঝে নিতে পারত। তার জন্যে বাড়িতে তাদের আর আলাদা করে নোট বই পড়তে হত না। জগদীশচন্দ্রের ক্লাশ নেবার সময়ে আর একটা মজার ব্যাপার হতে দেখা যেত। তিনি ক্লাশে ঢোকার অনেক আগেই ছাত্রদের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা লেগে যেত সামনের বেঞ্চে বসার জন্যে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এসব ঘটনার কথা বলেছেন। বলেছেন, জগদীশচন্দ্রের এ ধরনের শিক্ষা-দান ছাত্রদের পক্ষে খুবই কাজের হয়েছিল। তাঁর ক্লাশে ছাত্ররা দেখে এবং শুনে এমনভাবে শিখতো যে কোনদিন তা ভুলত না।

অধ্যাপক হিসেবে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি ছাত্রমহল থেকে ধীরে ধীরে কলেজের গণ্ডীর বাইরে ছড়াতে থাকল। শিক্ষা অধিকর্তা ক্রফট্-এর ধারণার পরিবর্তন হল, কলেজের অধ্যক্ষ টনিরও ভুল ভাঙ্গল। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিশেষত্ব অনুধাবন করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরাও হলেন তাঁর বন্ধু। জগদীশচন্দ্রের নীতিগত আদর্শের কাছে তাঁরা নত হলেন। তিন বছর কেটে যাবার

পরে কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর পদে যোগদানের প্রথম দিন থেকেই স্থায়ী পদে নিযুক্ত বলে মেনে নিলেন। তিন বছর ধরে তাঁর অনড় অটল মনোভাবই শেষে জয়ী হল। জগদীশচন্দ্রের মনোবল এতে আরো দৃঢ় হল, আত্মবিশ্বাস হয়ে উঠল আরো নির্ভীক।

তিন বছরের প্রত্যাখ্যান করা মাইনে এবার এক সঙ্গে পুরোপুরি সব পেয়ে গেলেন। পিতার ধারদেনা শোধ করতে বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি সব আগেই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনও সংস্কারই মানেন নি তিনি। কিন্তু তাতেও পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর জন্যে তাঁর মা কিছু টাকা এবং গয়নাগাটি আগলে রেখেছিলেন। পিতার ঋণ শোধ করতে তাও তিনি মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নেন। কিন্তু তাতেও সব ঋণ শোধ করা সম্ভব হয় নি। এবার বাকি ঋণ শোধ করার সুযোগ পেলেন জগদীশচন্দ্র তাঁর এই এককালীন তিন বছরের বাকি-বকেয়া মাইনের টাকা হাতে পেয়ে। পাওনাদারদের ডেকে তাদের শেষ পাইটি পর্যন্ত মিটিয়ে দিলেন। পাওনাদাররা বাকী পাওনা আদায় হবে আশা করে নি। তারা অবাক হল জগদীশচন্দ্রের নীতিবোধ দেখে।

বিবাহ

ঢাকা-বিক্রমপুরের দুর্গামোহন দাশ সেকালে কলকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতিমান অ্যাডভোকেট এবং ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা অবলা দাশের বিয়ে হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে। জগদীশচন্দ্র সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বেতন প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাপনা করে যাচ্ছেন আর অবলা দাশ তখন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছেন। বিয়ের একবছর পরে মারা গেলেন জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র, আর দু'বছর বাদে মা। অবলা বসু সংসারে অনভিজ্ঞা, জগদীশচন্দ্র তো বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু বোঝেনই না। হাল ধরেন অবলা।

ছেলেবেলা থেকে লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন অবলা বসু। আর দশটা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মতো রান্না-বান্না ঘর-গৃহস্থালীর কাজের সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না তাঁর। তাই তাঁর

মা-বাবার খুব দুশ্চিন্তা ছিল বিয়ের পরে এ মেয়ে শেষ পর্যন্ত কী-না অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু দেখা গেল, কোন কিছুতেই আটকে গিয়ে থমকে থাকার মেয়ে নয় অবলা। খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি সব বুঝে-শুনে-শিখে নিয়ে পাকা গৃহিণী হয়ে গেছেন। জগদীশচন্দ্রের যাবতীয় কাজ-কর্মের সঙ্গেও নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন সানন্দে। জগদীশচন্দ্রের পাশে থেকে তাঁর সুখ-সুবিধা, শোক-দুঃখ, উৎসব-আনন্দের সমভাগী হয়ে থেকেছেন সারা জীবন। যে মেয়ে রান্না-বান্না কাকে বলে জানতো না, এক সময়ে দেখা গেল তাঁর রান্না মাছের ঝোলের প্রশংসা করছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, তাঁর হাতের ঝাল তরকারী-চচ্চড়ির ভক্ত হয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

মা

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র সম্পর্কে যতটা জানা যায় তাঁর মায়ের সম্পর্কে কিন্তু সে তুলনায় আমাদের জানার সুযোগ খুব কম। তখনকার দিনের উচ্চ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত আবার স্বদেশিয়ানায় খ্যাত ভগবানচন্দ্র বসুর নাম সে সময়ের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত। সে জন্যে তাঁর কথা আমরা জেনেছি সহজে। কিন্তু তাঁর মা বামাসুন্দরী দেবীর কথা সামান্য দু'একটি পারিবারিক ঘটনা থেকে এবং জগদীশ-চন্দ্রের চারিত্রিক প্রবণতা থেকে আমাদের অনুমান করতে হবে।

ভগবানচন্দ্রের জীবনে তাঁর সহধর্মিণীর ভূমিকা তখনকার সামাজিক প্রচলন অনুসারে খুব একটা প্রত্যক্ষ ছিল মনে হয় না। কিন্তু তাই বলে তাঁর অস্তিত্ব বোঝা যাবে না তা ঠিক নয়। ভগবান-চন্দ্রের আদর্শে এবং কাজকর্মে তাঁর বিশ্বাস ও সহযোগিতা না থাকলে তাঁদের দাম্পত্য জীবন সহজ হত না। ভগবানচন্দ্র কেবল নিজের উপার্জিত অর্থই দেশসেবায় ব্যয় করতেন না। দরকার মতো প্রচুর ঋণও করতে হত তাঁকে। এ ব্যাপারে যদি সহধর্মিণীর মত না থাকত তা হলে হয়তো তাঁর পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হত না। অথবা, বামাসুন্দরী দেবীর যদি নিঃস্বার্থ মনোভাব না থাকত তা হলে হয়তো সংসারের আর্থিক দুঃখ-কষ্ট তাঁদের জীবনে তত ব্যাপক হত না।

স্বামীর ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে মহৎ কর্মপ্রেরণায় সহযোগিতার পরিচয় রয়েছে জগদীশচন্দ্রের মায়ের চরিত্রে। সেই

সঙ্গে উদারতা, স্নেহময়তা এবং শুভবোধও লক্ষ্য করা যায় তাঁর মায়ের স্বভাবে। জগদীশচন্দ্র যখন পড়াশোনা করতে বিলাত যাবার কথা বলেন, তাঁর মা প্রথমে রাজি হন নি ছেলে কাছ-ছাড়া হবার আতঙ্কে। তাঁর দ্বিতীয় ছেলে তখন মাত্র দশ বছর বয়সে মারা গেছে। তাই প্রথম ছেলে জগদীশকে কাছ-ছাড়া হতে না দেওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁর এই স্নেহ-দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে জগদীশচন্দ্রকে বিলেত যেতে শুধু মতই দেন নি, নিজের সামান্য পুঁজি এবং গয়না দিয়ে বিলেত যাবার

বামাসুন্দরী দেবী

খরচা পর্যন্ত যোগাবার প্রস্তাব করেছেন। বোঝা যায়, সন্তান-স্নেহে তিনি অন্ধ ছিলেন না। সন্তানের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার কথা ভেবে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছেন এবং ব্যক্তিগত সম্পদ নিঃশেষে উজার করে দিতে চেয়েছেন।

পিতৃঋণ শোধের জন্যে জগদীশচন্দ্র যখন পৈতৃক ভিটে-মাটি বিক্রি করে দেন, মা তাতে বাধা দেন নি। এমন কি, এর জন্যে যখন মায়ের গয়নাগাঁটি সব বিক্রি করে দেবার প্রস্তাব দেন

জগদীশচন্দ্র, তাঁর মা অনায়াসে তাঁর সঞ্চিত সম্পদ তুলে দিয়েছেন ছেলের হাতে। স্বামীর ঋণভারের দায় তো তাঁর উপরও বর্তাবে।

একদিকে পিতার স্বদেশ-চিন্তা অপর দিকে মায়ের স্নিগ্ধ মমতা জগদীশচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে খুব স্বাভাবিক ভাবে।

স্বদেশ-ভ্রমণ

বিয়ের পরে জগদীশচন্দ্র আর অবলা কিছুদিন চন্দননগরে ছিলেন। রোজ নৌকা করে গঙ্গা পার হয়ে নৈহাটিতে এসে ট্রেন ধরে কলকাতা আসতেন জগদীশচন্দ্র। আবার ফেরার পথেও ঐভাবে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগরে পৌঁছতেন। কিন্তু ফেরার সময়ে নৌকার মাঝি হতেন অবলা। রোজ বিকেলে তিনি চন্দননগর

নৌকার মাঝি অবলা

থেকে নিজে, একা নৌকা বেয়ে এ পাড়ে এসে অপেক্ষা করতেন। জগদীশচন্দ্র ফিরে এলে তাঁকে নিয়ে ফের পাড়ি দিতেন ওপারে। হয়তো এই সূত্রেই দেশ-ভ্রমণের একটা বিশেষ আগ্রহ ধীরে ধীরে

জেগে ওঠে স্বামী এবং স্ত্রী—উভয়ের মধ্যে। সে ইচ্ছা আরো প্রবল হয় পিতৃদেব থেকে পাওয়া স্বাদেশিকতার অনুপ্রেরণায়।

জগদীশচন্দ্র মনে করতেন নিজের দেশকে, দেশের মানুষকে চিনতে হলে, তাদের স্বজন হতে হলে দেশের বৈশিষ্ট্যবাহী অঞ্চল, বিশেষ স্থান, জনবসতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। তাই অধ্যাপনার জীবনে বাৎসরিক দু'টি দীর্ঘ ছুটির সময়, গরমের ছুটিতে, আর পূজার ছুটিতে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতেন জগদীশচন্দ্র আর তাঁর সহধর্মিণী অবলা।

ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত মন্দির, তীর্থস্থান, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান, গুহা-চৈত্য-স্তূপ ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তাঁরা। এই ভ্রমণে তখনকার দিনের একটি বড় বাক্স-ক্যামেরা থাকত তাঁদের সঙ্গে। যেখানেই যেতেন, মনে যা ধরতো, সেই ক্যামেরায় তার ফটো তুলে নিতেন। এভাবে সারা ভারতের নানা স্থানের একরাশ ছবি ধরে রেখেছিলেন জগদীশচন্দ্র। এই ভ্রমণে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন উৎসাহী সঙ্গী।

হিমালয় ছিল জগদীশচন্দ্রের ভ্রমণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। কয়েকবার তিনি হিমালয়ের নানা অঞ্চলে ঘুরেছেন। আজকাল হিমালয়ের নানা স্থানে চলাফেরার যেসব ব্যবস্থা হয়েছে, তখন সেসব কিছুই ছিল না। হিমালয় ভ্রমণ ছিল তখন ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের কাজ। দুর্গম পিণ্ডারী হিমবাহের সন্ধানে একবার হিমালয়ে গিয়ে এক ভীষণ দুর্ঘটনার সামনে পড়েন। তার পরের বছরই আবার সস্ত্রীক বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সেখানে গিয়ে খুঁজে বার করেন গঙ্গানদীর উৎসমুখ।

ছেলেবেলায় ফরিদপুরে গঙ্গার শাখা পদ্মা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বালক জগদীশের কৌতূহল দানা বাঁধত—বিপুল এ জলরাশি কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়? বালক বয়সের সে মহাবিস্ময় পরিণত বয়সে তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে গঙ্গা নদীর উৎস সন্ধানে। পিণ্ডারী হিমবাহের উৎস কুয়াশাচ্ছন্ন ত্রিশূল চূড়া। ত্রিশূল চূড়ার আকৃতি জগদীশচন্দ্রের মনে হয়েছে মহাদেবের চুলের জটার মতো। গঙ্গা সেখান থেকেই নেমে এসেছে নিম্নভূমিতে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-

বুদ্ধি আর দার্শনিক চিন্তা ভারতের চিরপ্রচলিত ধারণার রহস্য উদ্ঘাটন করল। ভারতবাসী মাত্রেই ধারণা গঙ্গা নেমেছে মহাদেবের জটা থেকে। আর এই গঙ্গা-অবতরণের পৌরাণিক কাহিনীও সুবিদিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মন সে কাহিনীতে তুষ্ট থাকে নি। সে কাহিনীর মূলে যে প্রাকৃতিক ঘটনা রয়েছে তা খুঁজে বার করেছেন হিমালয়ের ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে ঘুরে ঘুরে। তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নিবন্ধে প্রচলিত ধারণা আর প্রাকৃতিক উৎস মিলে যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে তাই তুলে ধরেছেন প্রশ্ন আর উত্তরের মাধ্যমে। প্রশ্ন, 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?' উত্তর, 'মহাদেবের জটা হইতে।'
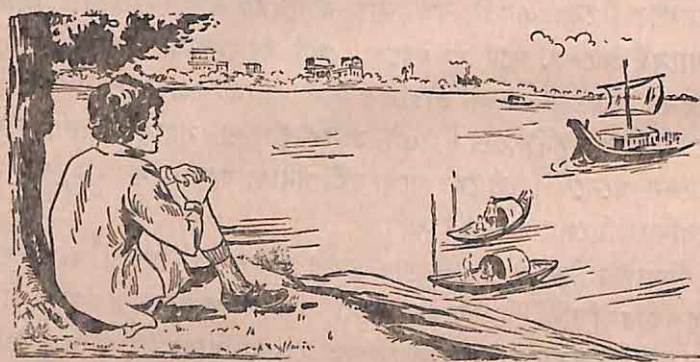
নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

অজন্তা-ইলোরার গুহামন্দির ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। তখনকার দিনের ভ্রমণের নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি দমেন নি। অজন্তার এক গুহাচিত্র দেখে পরবর্তী কালে তার বর্ণনা করেছেন তাঁর 'যুক্ত কর' নিবন্ধে। এ নিবন্ধটিও আছে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে।

নেপাল ভ্রমণের পরে সেখানকার এক ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে লিখেছেন 'অগ্নি-পরীক্ষা'। এ কাহিনীর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মানুষের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের প্রতি যে বিজ্ঞানীরও আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকা দরকার, জগদীশচন্দ্র যেন বিজ্ঞানীর সেই সহৃদয় কর্তব্যটি সাধন করেছেন নেপালের এ কাহিনীকে অবলম্বন করে রচনা লিখে।

কুমারিকা অন্তরীপ থেকে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর—ভারতের গুহামন্দির, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, স্তূপ-চৈত্য, ইতিহাসখ্যাত স্থান, কিছুই বাদ দেন নি। ঘুরে ঘুরে দেখেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন তাদের সঙ্গে বর্তমান ভারতের যোগসূত্র। অনুভব করেছেন প্রাচীন ঐশ্বর্য আর নবীন ভারতের দৈন্য-দুর্গতি। আর তা থেকেই হয়তো দৃঢ়পণ হয়েছেন মনে মনে—ভারতের এ দৈন্য ঘোচাতে হবে, এ দুর্গতি থেকে মুক্ত করতে হবে ভারতকে।

ছেলেবেলায় যাত্রাগান, পৌরাণিক কাহিনী, লোক-উৎসব থেকে যে-বিস্ময় আহরণ করেছিলেন তার চরিতার্থতা ঘটেছে পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ জাতক, রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যের জীবন-দর্শনে। এবং ভারত ভ্রমণে সেই জীবন-দর্শন মূর্ত হয়ে ফুটেছে জগদীশচন্দ্রের মননে। তাই দেখা যায়, তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও সঙ্কীর্ণ চেতনার উদ্ভব ঘটে নি। একদিকে উদার স্বদেশ-চেতনা অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক অন্বেষা—এই দুয়ে মিলে এক ব্যাপক মানবিক আদর্শ তাঁকে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রেরণা যুগিয়েছে।

সঙ্কল্প ও শপথ

অধ্যাপক হিসেবে প্রায় দশ বছর কেটে গেছে প্রেসিডেন্সি কলেজে। ছাত্রমহল এবং সহযোগী অধ্যাপকমণ্ডলীতে তিনি খ্যাতিমান অধ্যাপক তখন। কিন্তু তাঁর মন তুষ্ট নয়। আরও কী যেন চাই, কী যেন না হলে নয়। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর ছত্রিশতম জন্মদিনে অনুভব করলেন প্রাকৃতিক রহস্য সম্যক অনুধাবন এবং উন্মোচন করাই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ। এতে মানুষের সীমিত দৃষ্টি প্রসারিত হবে, অজ্ঞানতা দূর হবে, আর নব নব আবিষ্কারের দ্যুতিতে অন্বেষণের পথ হয়ে উঠবে আলোকিত। তা ছাড়া, অধ্যাপনার জীবনে তিনি লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষা-দীক্ষা তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরাধীন ভারতের অবমাননার অন্ত নেই। বিদেশী শাসক সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছে, ভারতে শিক্ষার আলো, জ্ঞানের আলো, বিজ্ঞানের আলো বলতে কিছু নেই। তারা কেবল ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন। তারা আধুনিক জগতের কর্মোদ্যোগের অনুপযোগী। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

তাদের অযোগ্যতা কল্পনা করা যায় না। জগদীশচন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, এই বিদেশী প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে অনুভূতি প্রকাশের পথ খুঁজে চলেছেন, কিন্তু স্পষ্ট করে ধরতে পারেন নি। ছত্রিশ বছর বয়সের প্রথম দিনটিতে তা যেন স্পষ্ট হল। তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, ভারতের নামে সকল মিথ্যা অপবাদ ঘোচাতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, ভারতের মানুষ কোন ক্ষেত্রেই অযোগ্য নয়।

যেমন অনুভব তেমন কাজ। জগদীশচন্দ্র স্থির-নিশ্চয় হলেন। ইতিপূর্বে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে ফটোগ্রাফি নিয়ে নানা পরীক্ষা-

যেমন অনুভব তেমন কাজ, জগদীশচন্দ্র স্থির নিশ্চয় হলেন

নিরীক্ষা করেছেন নিজের বাড়িতে ছোট একটি স্টুডিও মতো করে। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর কিছু নতুন চিন্তা-ভাবনার কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন।

তারও বহু আগে তিনি যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি. এ.

পড়ছেন, তখন বর্ধমানে তাঁর পিতার আবাসে একটি ছোট কামান তৈরি করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। বাড়ির অকেজো পিতল-লোহা গলিয়ে কলেজের একজন ছাত্রের পক্ষে একটি কামান গড়া কম কথা নয়। পারিবারিক উৎসবানুষ্ঠানে সে কামানে বারুদ পুরে কয়েকবার দাগাও হয়েছিল। সে ঘটনা হয়তো একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের একজন বিজ্ঞান সাধকের ক্ষেত্রে স্থির প্রত্যয়ের জন্যে সে ঘটনার গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কম নয়।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও বেতার

বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করবেন, কিন্তু তখন উপযুক্ত গবেষণাগার তো দূরের কথা, অতিসাধারণ কোন গবেষণাগারও নেই। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যে ঘর বা যন্ত্রপাতি কোন কিছুই ছিল না। কলেজের শৌচাগারের পাশে একটি ছোট্ট ঘরে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাগার তৈরি করে নিলেন। বিজ্ঞান-গবেষণার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি করে নেওয়াও অসম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। অদম্য প্রচেষ্টা আর উদ্ভাবনী প্রতিভায় অকেজো সব টিনের পাত, লোহার চাক্‌তি, কাঠের টুকরা প্রভৃতি হয়ে উঠল তাঁর যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম। সাধারণ কামার-মিস্ত্রীদের দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে থাকলেন তাঁর যন্ত্রপাতি।

কিছুকাল ধরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। ম্যাক্সওয়েল-এর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত্ত্ব, হার্ৎস্‌-এর গবেষণা এবং এ দুজন বিজ্ঞানীর তত্ত্ব ও গবেষণা নিয়ে লজ-এর বিভিন্ন রচনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। এসব নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা এবার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে লেগে গেলেন।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার পটভূমি তৈরি হয়েছিল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা করার সময়ে। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে কতগুলো গাণিতিক সিদ্ধান্ত করেন। সে উনিশ শতকের মধ্যপর্বের কথা। তাঁর পরে ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব-অনুসারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি করেন। জগদীশচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় কেম্ব্রিজে ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত পড়াশোনা করেছিলেন। তাঁর

ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে হার্ৎস-এর সম্পূর্ণ রচনাবলীটি পাওয়া যায়। মনে হয়, জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে প্রথম যে-গবেষণা শুরু করেন এবং সে গবেষণার উপযোগী যে-যন্ত্র উদ্ভাবন করেন তা তাঁর দীর্ঘ কালের চিন্তাভাবনার ফল, আকস্মিক কোনও ঘটনা নয়।

বিদ্যুৎ-শক্তির বিকিরণ-সম্পর্কিত তাঁর কাজের জন্যে মাস তিনেকের মধ্যেই তিনি একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করলেন। এ সময়ে তাঁর গবেষণার বিবরণ প্রকাশ করার দায়িত্ব নিল ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞান সংস্থা 'দি রয়্যাল সোসাইটি'।

পরীক্ষা-প্রদর্শন

তাঁর গবেষণা দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানী-মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ এবং হার্ৎস-এর উদ্ভাবিত অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যে সমধর্মী তা তিনি প্রমাণ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি তাঁর গবেষণার লিপিবদ্ধ ফলাফল পাঠ করেন ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে। এ বছরই রঞ্জন-রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে রঞ্জন-রশ্মির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে এই রশ্মি খুবই উপযোগী হবে সে বিষয়ে তিনি তখনই ইঙ্গিত দেন।

প্রায় ঐ একই সময়ে জগদীশচন্দ্র অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মাধ্যমে সঙ্কেত বা বার্তা পাঠাবার যে-পরীক্ষা করেন তাতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই আবিষ্কার হাতে-কলমে প্রদর্শন করেন। অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্রটি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘরে স্থাপন করেন। আচার্য রায়ও তখন এ কলেজের অধ্যাপক। পাশের আর এক অধ্যাপকের ঘরের ভেতরে একটি পিস্তল রাখা হয়। প্রেরক যন্ত্র থেকে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছাড়া হল। পাশের বন্ধ ঘরের দেয়াল ভেদ করে সেই অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গিয়ে পিস্তলে বিস্ফোরণ ঘটাল।

জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষায় সবাই হতচকিত। এও কি সম্ভব? অসম্ভব যে নয়, বাস্তবে তা অনেকে দেখেছেন। আরো অনেককে

দেখাবার আয়োজনও হল। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার টাউন হলে বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে এক সমাবেশে জগদীশচন্দ্র তাঁর এই অভাবিত আবিষ্কার প্রদর্শন করেন।

অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যে অনায়াসে যে-কোনও সঙ্কেত, যে-কোনও বার্তা মুহূর্ত মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে, জগদীশচন্দ্র তা দেখালেন নানা প্রক্রিয়ায়। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রও সেদিন উপস্থিত দর্শকদের বিস্মিত করেছিল। সেদিন, মনে মনে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাও হয়তো নিবেদিত হয়েছিল অদৃশ্যভাবে।

অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের যেসব অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখান জগদীশচন্দ্র, আজকের বেতার প্রক্রিয়ার তাই হল মূলসূত্র। পৃথিবীতে তাঁর আগে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে এভাবে কেউ আর কাজে লাগাতে পারেন নি। যদিও ঐ একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ঐ বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রই প্রথম সেই বৈজ্ঞানিক কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন।

তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার। সোসাইটিতে জগদীশ-চন্দ্রের অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমবর্তন সম্পর্কিত নিবন্ধ শুনে এবং তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখে তিনি অভিভূত হন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কারের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন। জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধটি কার্যবিবরণী-পত্রে প্রকাশ করা হয়। এর পরে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠান রয়্যাল সোসাইটির যুগ্ম-সচিব লর্ড র‍্যালের কাছে। লর্ড র‍্যালের অনুমোদনক্রমে জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ইলেকট্রিশিয়ান' পত্রিকায়।

দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি

রয়্যাল সোসাইটির পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার-মূলক কয়েকটি প্রবন্ধ পর পর প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপের বিজ্ঞানী-মহলে তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ দেখা দেয়। দেশ-বিদেশের

পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিয়ে নানা প্রশস্তি প্রকাশিত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে অর্থ এবং উপকরণ দরকার। পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। বিদেশী সরকার সহজে তাঁকে সাহায্য করতে রাজি নয়। অর্থ আর উপকরণের অভাবে তাঁর গবেষণার কাজ প্রায় বন্ধ হবার মুখে। লর্ড র‍্যালে ইংল্যাণ্ড থেকে শুনলেন সব। তাঁর ভারতীয় ছাত্রটি সম্পর্কে তিনি তখন অনেক আশা পোষণ করছেন। তাঁর ছাত্রের আবিষ্কার ও গবেষণায় তিনি মুগ্ধ। তাঁর কানে গেল জগদীশচন্দ্র অর্থাভাবে গবেষণার কাজে এগোতে পারছেন না। রয়্যাল সোসাইটি থেকে জগীদশচন্দ্রের গবেষণার জন্যে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন তিনি। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির গ্র্যান্ট ফাণ্ড থেকে সেই প্রথম একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী অর্থ সাহায্য পেলেন।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ছাত্রাবস্থায় দেখেছেন, ফাদার লাফোঁ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ জাগানোর জন্যে ছোট ছোট জনসমাবেশে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও দেখান। মানুষের তাতে জ্ঞান বাড়ে, কৌতূহল জাগে, জানার ঘুমন্ত আগ্রহ জেগে ওঠে। জগদীশচন্দ্র ফাদার লাফোঁর সেই আকর্ষণীয় পন্থাটিই অনুসরণ করেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের কাজ জনসমক্ষে প্রকাশের জন্যেই প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে, পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদর্শনী-বক্তৃতা দেন। এর পরে তিনি একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, দেশ-বিদেশের মানুষের সামনে সে সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন, যন্ত্রসহযোগে তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানী সকলেই অনুভব করেছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা অসাধারণ, তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের বহু বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলো প্রবেশের উদ্দেশ্যে। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ একজন ভারতীয়ের এই অবদান সেদিন কেউ অস্বীকার করতে পারে নি।

টাউন হলের ঘটনা এবং লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি থেকে

পৃষ্ঠপোষকতায় জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে দেশের সরকার কিছুটা মনোযোগী হলেন। বাংলার ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি তাঁর সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্যে এককালীন এক হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন।
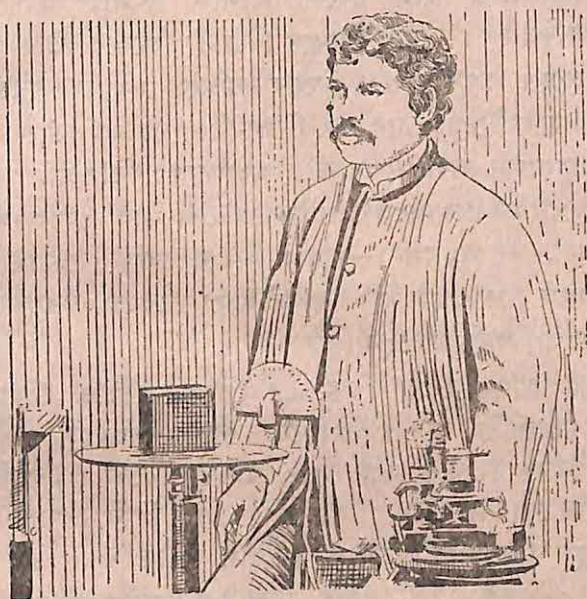
প্রদর্শনী-বক্তৃতা

এ পর্যন্ত গবেষণা করে দৃশ্য এবং অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেন, তা সব ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ করে একখানি সংকলন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ পুস্তিকা পাঠ করে পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন তাঁর নিজের একখানি নিবন্ধ-সংকলন উপহার পাঠিয়ে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দিত করেন। এ সময়েই (১৮৯৬ খ্রীঃ) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ডি. এসসি. উপাধি দেওয়া হয়। তখনকার দিনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বীকৃতি একজন ভারতীয়ের পক্ষে কেবল সম্মানের নয়, স্মরণযোগ্যও বটে।

বিরোধ-বিড়ম্বনা

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের নাম 'কোহেরার'। এই 'কোহেরার' যন্ত্র তখন ইউরোপের বিজ্ঞানীরা যে-পদ্ধতিতে তৈরি করতেন, তাতে

অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তত সহজে ধরা যেত না। জগদীশচন্দ্র গ্যালেনা নামের এক রকম স্ফটিক ব্যবহার করে আশ্চর্য ফল পান। এই নিয়ে তখন তাঁর নানা চিন্তাভাবনা চলছে। তাঁর পদ্ধতিটি যাতে আরো উন্নত এবং কাজের হয় সে বিষয়ে তখন নানা পরীক্ষা করে চলেছেন। বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আসছে উৎসাহ-প্রেরণা-সূচক অভিমত-অভিনন্দন। দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। তখন স্বদেশে, নিজের কর্মস্থলে দেখা দিল বিড়ম্বনা। কলেজের সহযোগীদের দু'চার জন, শিক্ষা-বিভাগের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন, অধ্যাপকের কাজ অধ্যাপনা। তিনি যদি গবেষণা নিয়েই মত্ত থাকেন তো অধ্যাপনার কাজে তো ফাঁক থেকে যাবে। হয় গবেষণা, নয় অধ্যাপনা—দুটোর একটা বেছে নেওয়াই ভাল, দু-ই এক সঙ্গে হতে পারে না। জগদীশচন্দ্র গবেষণা করতে গিয়ে অধ্যাপনায় গাফিলতি করছেন।

বিষয়টি অভিযোগের, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে চিরাচরিত সাধারণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের ঈর্ষাকাতরতা। ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি অবস্থাটা বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন। ব্যাপারটা যাতে জটিল আকার ধারণ না করে তার জন্যে তিনি শিক্ষা-বিভাগে একটি নতুন পদে জগদীশচন্দ্রকে নিয়োগ করার কথা ভাবলেন। সরকারী কলেজগুলোতে যাতে বিজ্ঞান-গবেষণাগার গড়া যায় এবং ছাত্ররা যাতে বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে পারে তার দেখাশোনা করার দায়িত্বে থাকবেন জগদীশচন্দ্র। এ কাজে তাঁর নিজের গবেষণাকর্মের জন্যে অনেক বেশি সময় পাবেন আর পদ হিসেবে মাইনেও পাবেন অনেক বেশি। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ তাতে রাজি হল না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার-মনোনীত সদস্য ছিলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের নির্দেশ-হুকুম কখনো বিনা-বিচারে মানতে রাজি হন নি তিনি। শিক্ষা-বিভাগের বিরূপতার প্রধান কারণ এই। কিন্তু ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি তাঁর প্রতি বরাবরই সহানুভূতিশীল ছিলেন। নতুন পদে তাঁকে নিযুক্ত করতে না পারলেও তাঁর গবেষণার জন্যে ব্যক্তিগত সব খরচপত্র যাতে সরকার দেয় সে ব্যবস্থা তিনি করলেন। জগদীশচন্দ্র তা গ্রহণ করতে রাজি না হওয়ায় সরকার তখন সে অর্থ প্রেসিডেন্সি কলেজে

গবেষণার জন্যে দিতে সিদ্ধান্ত করেন। এই অর্থের পরিমাণ ছিল বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা।

দেশ-বিদেশে খ্যাতি এবং স্বদেশে সরকারের আনুকূল্য দেখে হয়তো শেষপর্যন্ত 'গাফিলতির' অভিযোগকারীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। তারপরে আর এ ধরনের অভিযোগ শোনা যায় নি। জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে এটাও একটা পরিহাস বলা যায়। অধ্যাপক হিসাবে যিনি প্রথম দিন থেকে অক্লান্ত, খ্যাতিমান, ছাত্রসমাজের প্রিয়; বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সে কাজে গাফিলতি দেখাবেন, তা ভাবা যায় না। সেদিন তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ যারা তুলেছিল, মনে হয়, তারা কেবল ঈর্ষাকাতরই ছিল না, জগদীশচন্দ্রের কাজ বোঝার ক্ষেত্রেও তারা ছিল অযোগ্য।

যে-কোনও বিপরীত অবস্থায় নিজের সংগ্রামী কর্মোদ্যোগই মানুষকে তার সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। অবস্থার দোষারোপ করে নিজে নিষ্ক্রিয় থাকলে, না নিজের না অন্যের—কারও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। জগদীশচন্দ্র এসব বুঝেছিলেন গোড়াতেই। 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার প্রথম পর্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'ভারতবাসীরা কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোন দিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এ দেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনদিনই হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। ...এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল।'

নতুন উদ্যম

একদিকে অধ্যাপনা অন্য দিকে গবেষণা। অধ্যাপনার শেষে প্রতিদিন গবেষণার কাজে এগিয়ে যেতে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত তাঁকে। তা ছাড়া, দেশে তাঁর গবেষণার মূল্যায়ন তেমন হচ্ছিল

না। কারণ, তখন সারা ভারতে বোধ হয় জগদীশচন্দ্রের মতো আর কেউ ছিলেন না যিনি উচ্চতর বিজ্ঞান-সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছেন। তাই, তাঁর এটা বোধ হওয়া স্বাভাবিক যে, তাঁর গবেষণার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য বর্তমান আবিষ্কারের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন দরকার। এবং সে মূল্যায়ন করতে পারে সমকক্ষ বিজ্ঞান-সাধকরা। তখন একমাত্র ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি প্রভৃতি জায়গাতেই পৃথিবীর খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজেদের কাজ নিয়ে মগ্ন আছেন। তাঁদের কাজ সম্পর্কেও তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দরকার। জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের গবেষণা এবং আবিষ্কার সম্পর্কে এই সব বিজ্ঞান-সাধকদের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শের কথা ভাবতে থাকলেন। তা ছাড়া, এক ধরনের ক্লান্তিবোধও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি বুঝলেন, তা থেকে মুক্ত হতে না পারলে তাঁর সব উদ্যম ব্যর্থ হবে।

অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে এলেন, ইউরোপে যেতে হবে। এ সময় লর্ড র‍্যালে কলকাতা আসেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কাজ দেখতে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সব দেখে তিনি খুশি হলেন। জগদীশচন্দ্রকে নতুন উদ্যমে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিলেন। তিনিও পরামর্শ দিলেন ইউরোপ যেতে। সেখানে যেমন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ আছে, তেমনি সেখানকার বিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষণাগারগুলোতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলেছে সেসবও প্রত্যক্ষ করা সহজ হবে বলে তিনি অভিমত দিলেন।

তাঁর নিজের চিন্তার সঙ্গে লর্ড র‍্যালের অভিমত মিলে যাওয়ায় তাঁর উদ্যম বেড়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু একটি আশ্চর্য বিরূপ অবস্থাও সেদিন তাঁকে কিছুটা বিব্রত করেছিল। লর্ড র‍্যালে যেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখতে যান সেদিন বিকেলেই কলেজের অধ্যক্ষ লিখিতভাবে তাঁর কাছে জবাবদিহি করেন, "লর্ড র‍্যালের বাচনিক জানা গেল যে, আজ সকালে আপনি তাঁকে কলেজের গবেষণাগার দেখিয়েছেন। কোন্ অধিকারে আপনি একজন বাইরের লোককে গবেষণাগারে ঢুকতে দিলেন জানালে খুশি হব।'

এ ঘটনায় তিনি বুঝলেন বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে এমন একটি

গবেষণাগার দরকার যেখানে কোনও বাধা-নিষেধের সংকার্ণতা থাকবে না। কলেজের অধ্যক্ষের অভিযোগের প্রতিবাদ করেন জগদীশচন্দ্র। তাতে ফল হল বিপরীত। প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে কাজ করাই শক্ত হয়ে উঠল।

হয়তো এ ঘটনাতে তাঁর বিদেশ যাবার ইচ্ছা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি বিদেশ-যাত্রার জন্যে সরকারের কাছে ছুটির আবেদন করেন। তাঁর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দেওয়া এবং সেখানে একটি নিবন্ধ পাঠ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্য প্রধান গবেষণাগারগুলো ঘুরে দেখা। ছোটলাট ম্যাকেঞ্জি প্রথমে বলেন, শিক্ষা-সংক্রান্ত ভ্রমণে বাইরে প্রতিনিধি পাঠানো সরকার অনুমোদন করতে পারে না। শিক্ষাবিভাগ তখন জগদীশচন্দ্রের অনুকূলে। শিক্ষা-অধিকর্তা আলফ্রেড ক্রফট্ জগদীশচন্দ্রের ইউরোপ ভ্রমণের সমর্থন করে বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে চিঠি দেন। তাতে কাজ হল। ছয় মাসের জন্যে তাঁকে বিদেশে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আবার বিদেশে

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪-এ জুলাই বোম্বে থেকে জাহাজে যাত্রা শুরু। সঙ্গে সহধর্মিণী অবলা বসু। ২১-এ সেপ্টেম্বর লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞানী-সম্মেলনের তারিখ। সেখানে জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখাবেন। পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি স্যার জি. জি. টমসন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার বিষয় জেনে লিখে জানান যে, বিষয়টি যে সকলের আগ্রহ সৃষ্টি করবে তাতে তিনি নিঃসন্দেহ। স্যার টমসন-এর এ বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত হয় যখন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা উৎসাহে উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে তাকে অভিনন্দন জানান।

ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতাসহ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার প্রদর্শন শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু সেই বৃদ্ধ বয়সেও জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষায় বিজ্ঞানের নতুন

সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখে তিনি মহিলাদের আসনের সামনে গিয়ে অবলা বসুকে পর্যন্ত প্রবল উৎসাহে অভিনন্দন জানান। বৃদ্ধ বিজ্ঞানী তাতেই তাঁর কর্তব্য শেষ মনে করেন নি। তিনি ভারতসচিবকে পর্যন্ত এক পত্রে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি উপযুক্ত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে জগদীশচন্দ্রকে তার পরিচালনার দায়িত্ব দিতে অনুরোধ করেন।

ইউরোপের বিজ্ঞানী-মহলে জগদীশচন্দ্র আলোড়ন তুললেন। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর নতুন তথ্যের সঙ্গে তা প্রমাণের স্ব-উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সরল ও সাবলীল গঠন এবং নিখুঁত ও নির্ভুল কার্যকারিতা সবাইকেই বিস্ময়ে অভিভূত করল। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকাতেও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিয়ে সপ্রশংস সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকল।

লিভারপুলের পরে লণ্ডনে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতার তারিখ ২০-এ জানুয়ারি, ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দ। সেটা ছিল রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য আলোচনা সভার দিন। প্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চতর গবেষণায় নিরত বিজ্ঞানীরাই কেবল এ সভায় আমন্ত্রিত হতেন।

রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে প্রথম বক্তৃতা দিতে গিয়েই জগদীশচন্দ্রের মনে একটি বিশেষ স্বপ্ন জেগে ওঠে। ভবিষ্যতে সে স্বপ্নই 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' রূপে বাস্তবে গড়ে উঠেছিল। তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন, "সভাপতির পার্শ্বে আমি বসিলাম, যে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃতা দিতেন, সেই হলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ বাঙালী বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হইল। ভারতের জয়-পতাকা আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম। অন্যান্য সভার রীতির মতন এই সভাতে বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই। কারণ এখানে যিনি বক্তৃতা দেন তাঁহাকে সকলেই জানে। সুতরাং ঘড়িতে নয়টা বাজিবামাত্র আচার্য বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা নীরবে সকলে বক্তৃতা শুনিলেন এবং বক্তৃতা অন্তে সকলেই আচার্যকে ঘিরিয়া অভিবাদন করিলেন। লর্ড র‍্যালে বলিলেন যে, এরূপ নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনও হয় নাই,—দু'একটি ভুল হইলে মনে হইত যেন জিনিসটা বাস্তব। এ যেন মায়াজাল। আমি যখন আচার্যের সহিত ইংলণ্ডে যাই তখন জড়পিণ্ডবৎ ছিলাম। কিন্তু এই সব

লোকের সংস্পর্শে আসিয়া দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই আমাদের দেশে এরূপ কোন স্থান করিবার বাসনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের সূচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ভ হইল।"

শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য অধিবেশনে বক্তৃতার পরে ইউরোপের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। ভারত-বিদ্বেষী পত্রিকাগুলো পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-বিষয়ে নানা সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশ করে। তখনকার দিনে 'দি টাইম্‌স্' এবং 'দি স্পেক্টেটর' ছিল অন্যতম ভারত-বিদ্বেষী। এ দু'টি কাগজ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ইণ্ডিয়া অফিস ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই অসাধারণ সফলতায় মুগ্ধ হয়ে জগদীশচন্দ্রের আরো ছমাসের ছুটি বাড়িয়ে দেয়। অপরদিকে রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার, লর্ড কেলভিন এবং স্যার উইলিয়াম রামসে উদ্যোগী হয়ে খ্যাতিমান ব্রিটিশ-বিজ্ঞানীদের স্বাক্ষর নিয়ে ভারত-সচিবকে এক পত্রে অনুরোধ করেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যেন একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

ভারত-সচিব তাঁদের অনুরোধে সাড়া দেন। ভারত সরকার একটি গবেষণাগার স্থাপনের অনুমতি দেন। এর জন্যে প্রাথমিক ব্যয় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড দেবার ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ এ ব্যাপারে উদাসীন থাকায় গবেষণাগার বিষয়টি এখানেই চাপা পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত বাংলা সরকার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার জন্য আড়াই হাজার টাকা এবং ভারত সরকার দু'হাজার টাকা বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর করেন।

আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এভারেট অনুরোধ জানালেন সেখানে এক বিজ্ঞান সভায় জগদীশচন্দ্রকে বক্তৃতা দেবার জন্যে। সময় নেই। সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না। তার আগেই ফ্রান্স ও জার্মেনির বিভিন্ন শিক্ষায়তন এবং বিজ্ঞান সংস্থা পরিদর্শনের দিন-তারিখ ঠিক করা রয়েছে।

বার্লিনের বিজ্ঞান পরিষদে বক্তৃতা দেন ৫ই মার্চ। এপ্রিল মাসে তাদের মুখপত্রে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ প্রকাশিত হয়।

সব জায়গাতেই তাঁর বক্তৃতা জ্ঞানী-গুণী সমাজকে খুব আকৃষ্ট করে। হাইডেলবার্গ থেকে বৃদ্ধ অধ্যাপক কুইংক পর্যন্ত আসেন বার্লিনে তাঁর বক্তৃতা শুনতে। বক্তৃতা শুনে তিনি এত খুশি হন যে, জগদীশচন্দ্রকে তাঁর নিজের গবেষণাগার দেখার জন্যে হাইডেলবার্গে যেতে অনুরোধ করেন। জগদীশচন্দ্র এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর অনুরোধ রক্ষা করেন। তাঁর গবেষণাগার দেখতে গিয়ে পরিচিত হন লেপার্ড এবং আরও কয়েকজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে। সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মার্চ। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও সমবর্তন সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শ্রোতাদের এমন আকর্ষণ করে যে, ২২-এ মার্চ পদার্থবিজ্ঞান সমিতিতেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। তাঁর এই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক কর্নু, লিপম্যান, পোঁয়াকারে, ব্যাকরেল-এর মত বিজ্ঞানীরা। তাঁরা সবাই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে উচ্ছ্বসিত হন। তাঁদের পদার্থবিজ্ঞান সমিতির সদস্যপদ দিয়ে ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করেন তাঁরা।

প্রমথবারের বিদেশ ভ্রমণ এখানেই শেষ হয়। মার্শাই হয়ে দেশে ফিরে এলেন। ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে ইউরোপের ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিয়ে এলেন জগদীশচন্দ্র। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণা ও তথ্য এমন মৌলিক ছিল যে, তা অস্বীকার করা কারও পক্ষে সম্ভব তো হয়ই নি, বরঞ্চ পরাধীন ভারতের সহায়-সম্বলহীন একজন বিজ্ঞান-সাধকের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফল দেখে সকলে অভিভূত হয়ে পড়েন।

স্বদেশে

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশে ফিরেছেন জগদীশচন্দ্র। বিদেশে তাঁর খ্যাতির গুঞ্জন দেশের মানুষকে উদ্বেল করেছে। দেশের মানুষের হৃদয়ে জমা হয়ে আছে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা। বিজ্ঞানীকে কাছে পেয়ে সে শ্রদ্ধা আর বিস্ময় বাঁধ মানে না। দেশে ফিরে তাই বড় ব্যস্ত আছেন জগদীশচন্দ্র। এখানে অভিনন্দন, ওখানে সভা, সেখানে বক্তৃতা—এসব নিয়ে তাঁকে প্রায় সময়ই বাইরে কাটাতে হচ্ছে। বাড়িতে তাঁকে পাওয়াই ভার।

একদিন রাত্রিতে বাড়ি ফিরে দেখতে পেলেন তাঁর টেবিলের ফুলদানীতে একটি টাট্‌কা ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল ঝলমল করছে। শুনলেন রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। তাঁকে না পেয়ে অভিনন্দনের ম্যাগ্‌নোলিয়া রেখে গেছেন ফুলদানীতে। জগদীশচন্দ্র অবাক হলেন, খুশিও হলেন। কবির উপযুক্ত অভিনন্দনই বটে। অসাক্ষাতেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে কবির হৃদ্যতা গড়ে উঠল।

ম্যাগনোলিয়া ফুল ঝলমল করছে

জগদীশচন্দ্র এ সময়ে থাকতেন কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীটে আনন্দমোহন বসুর বাড়িতে। কিছুদিন পরে চলে আসেন সার্কুলার রোডের বাড়িতে। সেখানে নিয়মিত আসতেন রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, লোকেন পালিত, নীলরতন সরকার প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এবং মিসেস ওলেবুল-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে জগদীশচন্দ্রের। পরে এঁরা দুজন বিজ্ঞানীর পারিবারিক জীবনে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। জগদীশচন্দ্রের পারিবারিক সূত্রে নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও পরিচয় হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন অত্যন্ত আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-বিষয়ে নানা আলোচনা করতেন।

দৃঢ়চেতা জগদীশচন্দ্রের কাজকর্ম দেখে ভগিনী নিবেদিতা বুঝতে পারেন, এমন একজন প্রতিভাবান মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার দরকার আছে। কেননা, তিনি দেখেছেন, পদে পদে কত রকমের বাধা-বিপত্তি এসে এই বিজ্ঞানীর পথ রোধ করছে। কিন্তু

জগদীশচন্দ্র দুর্জয়। সে সব বাধা-বিঘ্ন উৎরে এগিয়ে যাবার মতো মনোবল তাঁর আছে ঠিক, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ যদি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়, এগিয়ে চলা সহজ হতে পারে। এসব ভেবেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে বিস্তারিতভাবে জগদীশ-চন্দ্রের গবেষণা প্রসঙ্গে তাঁর সঠিক অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁকে যেসব অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তা যে দুঃখজনক, সে সম্পর্কে ভগিনী তাঁর ক্ষোভের কথাও বলতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে ভগিনী নিবেদিতা বসু-পরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। ১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি দু'বার ভয়ানক অসুস্থ হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসু তখন নিজের আত্মীয় জ্ঞানে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিংয়ে পরলোক গমন করেন। তখনও তাঁর শয্যাপার্শ্বে জগদীশ-চন্দ্র এবং অবলা বসু ছিলেন অতন্দ্র।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার সমস্যা-সঙ্কুল অবস্থায় ভগিনী নিবেদিতার উৎসাহ এবং আগ্রহ যে তাঁকে কতখানি সহায়তা করেছিল, রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে বলেছেন, "......তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।"

নয়া উন্মেষ

দেশে ফিরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে প্রবল উদ্যমে গবেষণা শুরু করলেন জগদীশচন্দ্র। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি তাঁর ছয়টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করে। মিচিগান, বেলফাস্ট, ডাবলিনের পদার্থবিজ্ঞানীরা এসব নিবন্ধ পাঠ করে তাঁকে উৎসাহব্যঞ্জক অভিনন্দন জানান।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির নতুন নতুন রহস্য উন্মোচনে গবেষণার কাজ চলছে। জগদীশচন্দ্র তন্ময়। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, গবেষণাগারের গ্রাহক-যন্ত্রে জীবকোষের শ্রান্তির মতো একটা ব্যাপার ঘটছে। অথচ গ্রাহক-যন্ত্রটি অজৈব বস্তু দিয়ে তৈরি। ব্যাপারটা

ভাল করে বোঝার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, ক্রমাগত ব্যবহারে গ্রাহক-যন্ত্রটির সংবেদনশীলতা কমে যায়। কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ রেখে তাকে বিশ্রাম দিলে সে যন্ত্র আবার আগের সংবেদনশীলতা ফিরে পায়। অবাক কাণ্ড! অজৈব পদার্থের মধ্যে জৈব পদার্থের সংবেদনশীলতার লক্ষণ যে স্বপ্নাতীত ঘটনা! কিন্তু তাই ঘটছে। জগদীশচন্দ্র নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবলেন।

এ হল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের কথা। তখন প্রথম সারির পদার্থ-বিজ্ঞানী রূপে জগদীশচন্দ্রের নাম জানে সারা পৃথিবীর মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তখন জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তথ্যের অনুসরণে গবেষণার উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ায় সাফল্যের কথাও জানিয়েছেন অনেকে। আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞানী লিখেন, "......আপনার পরীক্ষাগুলোর পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করছি। পরীক্ষায় প্রাথমিক পর্যায়ে যে চমকপ্রদ ফল পাওয়া গেছে, তা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি। ......এ সম্পর্কে আরও পরীক্ষা করতে চাই। আপনার কাছ থেকে কোন রকম নির্দেশ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।"

কিন্তু জগদীশচন্দ্র তখন জৈব ও অজৈব পদার্থের সংবেদনের সাদৃশ্য দেখে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা থেকে সরে আসছেন। পদার্থবিদ্যা থেকে শারীরবিদ্যার দিকে তাঁর গতি পরিবর্তিত হচ্ছে। গবেষণার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করতে করতে তিনি এই সত্যে উপনীত হলেন যে, জীব ও জড়ের মধ্যে বাইরের সীমারেখায় যত ব্যবধানই থাকুক না কেন, আভ্যন্তরীণ সীমা অতি সামান্য।

তাঁর সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণের জন্যে অক্লান্ত গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। জৈব ও অজৈব পদার্থের ওপর আণবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র গ্রহণ করার জন্যে যন্ত্রও তৈরি করলেন। সে যন্ত্রে বাইরের উত্তেজনায় জৈব পদার্থের অভ্যন্তরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার চিত্র-লেখ তুললেন। একই প্রক্রিয়ায় অজৈব পদার্থের ওপরে উত্তেজনার চিত্র-লেখ ধরে উভয়ের তুলনা করে বুঝলেন, তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল। কেননা, উভয় ক্ষেত্রে সাদৃশ্য এত ব্যাপক যে, কোন্‌টা

জৈব বস্তুর উত্তেজনার চিত্র-লেখ, আর কোন্‌টা অজৈব বস্তুর উত্তেজনার চিত্র-লেখ, বলে না দিলে পার্থক্য বোঝা মুশকিল। নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে লোহার উপর সামান্য উত্তাপের প্রতিক্রিয়ার চিত্র-লেখর সঙ্গে জৈব পেশীর উত্তেজনার চিত্র-লেখ নিয়ে তুলনা করে দেখেন যে, জৈব-পেশী যেমন উত্তেজনার বৃদ্ধিতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তারপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে তা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, লোহার ক্ষেত্রেও প্রায় সেই একই ব্যাপার ঘটে। এ ভাবে, বিষক্রিয়ায় যেমন জীব বা প্রাণীর মৃত্যু হয়, কোন কোন অজৈব বস্তুতে বিষপ্রয়োগ করে দেখা গেল উজ্জীবনের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটে।

এ ভাবে নানা রকমের পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র বুঝলেন যে, অসার বা জড় বলে যেসব বস্তু আমাদের চারপাশে রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাণিসুলভ এক ধরনের সংবেদনশীলতা আছে। খালি চোখে ধরা না পড়লেও তা সত্য।

তাঁর এ অসাধারণ আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের চোখের সামনে তুলে ধরা দরকার। শুধু মাত্র চিঠি-পত্রে বা নিবন্ধ প্রকাশ করে এ সত্য সকলকে বোঝানো সহজ হবে না। আবার বিদেশ-যাত্রার কথা ভাবলেন। বিদেশে আর একবার না গেলে নিজের এ নতুন আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। বিদেশে যাবার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

এ সময়ে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে প্যারিস প্রদর্শনী। সেখানে আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। জগদীশচন্দ্রের কাছে সে অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ এল। স্থির করলেন, এ অধিবেশনে যোগ দেবেন। জড় ও জীবের আভ্যন্তর সংবেদন সম্পর্কে তাঁর নতুন আবিষ্কার নিয়ে সেখানে বক্তৃতা দেবেন। দেখা করলেন বাংলার নতুন ছোটলাট উডবার্ণ-এর সঙ্গে। তাঁর প্রতি উডবার্ণ-এর সহানুভূতি ছিল। তিনি তাঁর প্যারিস কংগ্রেসে যাবার অনুমতি সম্পর্কে আশ্বাস দিলেন, চেষ্টা করবেন। কিন্তু সবই নির্ভর করে ভারত-সচিবের বিবেচনার ওপরে।

শিক্ষা-অধিকর্তা ভুল বুঝলেন। সরাসরি ছোটলাটের সঙ্গে

দেখা করায় তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। এ সময়ে উডবার্ণ জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগার দেখতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসেন। গবেষণার নবতম আবিষ্কার দেখে তিনি বিস্মিত হন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় সহায়তার জন্যে তিনি কয়েকটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন। এ ঘটনায় শিক্ষা-অধিকর্তার ভুল ভাঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপত্তি ওঠে। প্যারিস কংগ্রেসে যাবার উপযুক্ত বলে মনে করেন নি তাঁরা জগদীশচন্দ্রকে। এ ছাড়া, আরো কিছু বাধা-বিঘ্ন উৎরে প্যারিস কংগ্রেসে যাবার জন্য ভারত-সচিবের অনুমতি লাভ করেন জগদীশচন্দ্র। 'জড়ের প্রাণস্পন্দন' নিয়ে তাঁর গবেষণা প্যারিস কংগ্রেসে প্রদর্শনের প্রয়োজনের কথা মেনে নেন সরকার।

প্যারিস যাবেন, কিন্তু টাকা কোথায়? প্রচুর টাকার দরকার। কে দেবে? রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এলেন। জগদীশচন্দ্রের সম্পর্কে উৎসাহী ও আশাবাদী মানুষ বোধ হয় তখন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। তাঁর অনুরোধে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বিদেশ যাবার জন্যে পনেরো হাজার টাকা দেন জগদীশচন্দ্রকে।

প্যারিসে রওনা হলেন ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। যাবার আগে, জুন মাসে একমাত্র কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে লিখে জানিয়েছিলেন নিজের মনের কথা। ২৯-এ জুন এক পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'সম্মুখে অনেক আশা ও নৈরাশ্যের কারণ আছে। দেশ ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া অবসাদে মন আক্রান্ত।'

প্যারিস কংগ্রেসে

প্যারিসে আসেন আগস্ট মাসে। সঙ্গে সহধর্মিণী অবলা বসু। বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি রূপে যোগ দেন প্যারিস পদার্থ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে। জড়ের প্রাণস্পন্দন সম্পর্কে তাঁর অনুভবের প্রথম ঘোষণা এখানে।

আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সেই সম্মেলনে তিনি বলেন, "জীব ও জড়ের মধ্যে যে প্রাণধর্মের লীলা চলছে, কোথাও তার ছেদ নেই। দুয়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করা কঠিন—কোথায়

জড়-প্রকৃতির শেষ, কোথায় জীবন ধর্মের শুরু। অবশ্য যেমন মনগড়া অসংখ্য সীমারেখা টানা যায়, কোন একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও তেমনি জীব ও জড়-প্রকৃতির আপাত-ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করা চলে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের যে স্বাভাবিক প্রবণতা তাকেই শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গত কারণ হিসেবে উপস্থিত করা যায়।"

একজন পদার্থবিজ্ঞানীর মুখে জীব ও জড়ের মধ্যে একই প্রাণ-ধর্মের লীলা প্রত্যক্ষ করা অস্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হবার কথা। কিন্তু যে-সে সে কথা বলছেন না। সে কথা বলছেন কয়েক বছর পূর্বে যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মারফৎ সংকেতবার্তা প্রেরণের বিস্ময়কর প্রক্রিয়া। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা চমকিত হলেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার অসাধারণ মৌলিকতা সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। কিন্তু এখন তিনি তাঁদের যা বলছেন তা অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য হলেও তা যে সত্য, জগদীশচন্দ্র তা প্রমাণ করেন নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা নব নব গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে।

এই প্যারিস বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙ্গালীর আর এক মহা প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে এই বিজ্ঞান অধিবেশনে জগদীশচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন, "আজ ২৩শে অক্টোবর ও কাল সন্ধ্যার সময় প্যারী হতে বিদায়। এ বৎসর প্যারী সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহা-প্রদর্শনী। নানা দিক্‌দেশ-সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করেছেন আজ এ প্যারীতে। মহাকেন্দ্রের ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজন-সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্মান, ফরাসী, ইংরেজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর, বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা করলেন— সে বীর জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. বোস। এক যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্ত্যমণ্ডলীকে নিজের

প্রতিভা মহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎ সঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ—জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী-সাধ্বী সর্বগুণসম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।"

প্যারিস পদার্থবিজ্ঞান
কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্র

জীব ও জড়ের প্রাণস্পন্দন বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বিস্ময়কর তো বটেই, রহস্যময়ও ঠেকেছিল সকলের কাছে। প্যারিস পদার্থ-বিজ্ঞান কংগ্রেসের মহাসচিব জগদীশ-চন্দ্রের আবিষ্কারে নিজেকে হতবুদ্ধি বলে ঘোষণা করেন। এ আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের ওপরে অভাবিত প্রভাব বিস্তার করে। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-নিবন্ধ সম্মেলনের বিবরণীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়।

প্যারিস কংগ্রেসের পরেই সরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়, ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতি এবং প্রাণিবিজ্ঞান সমিতিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর নবতম আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। এসব উপলক্ষে জার্মানী, রাশিয়া, আমেরিকা তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় তাঁর। তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়ারবুর্গ জানান, তাঁর এক গবেষক ছাত্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে বিষয়টি যে জটিল এবং দুরূহ সে কথা তাঁকে বলেন। তার উত্তরে তিনি তাঁর ছাত্রকে বলেছেন, জটিল এবং দুরূহ হলেও অত্যন্ত কৌতূহলের। তবে, এখন আর তেমন নয়। কেননা, শ্রীবসু নামে এক বিজ্ঞানী এ নিয়ে গবেষণার শেষ রাখেন নি।

কেবল বিজ্ঞানীদের কাছেই নয়, প্যারিস কংগ্রেসের পরে সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছেও জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি পৌঁছেছিল। প্যারিসে ইফেল টাওয়ারে উঠতে গিয়ে তিনি এবং তাঁর সহধর্মিণী অবলা বসু এক মজার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। প্যারিস কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে ইফেল টাওয়ারে উঠতে জগদীশচন্দ্রের কোনও টিকিট লাগে নি। কিন্তু বাধা পেলেন অবলা বসু। তাঁকে টিকিট কাটতে হল। ফরাসী ভাষা বোঝেন না বলে তাঁদের সাহায্য করতে ইংরেজি জানা এক ফরাসী ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। জগদীশচন্দ্রের পরিচয়-পত্র দেখে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'বসু! জগদীশ বসু নন তো!' তাঁর সে বিস্মিত চিৎকারে উপস্থিত মানুষজন এবং টিকিট-বিক্রেতা হতবাক। ব্যাপার জেনে টিকিট-বিক্রেতাকে সবাই গাল-মন্দ দিতে থাকে।

প্যারিস কংগ্রেসে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী-মহলে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের এক জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। জড়ের প্রাণ-স্পন্দনের কথা দেখতে না দেখতে ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপের সব জায়গায়। সাধারণ মানুষের তো কথাই নেই, বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। এ-ও কি সম্ভব? এ-ও কি বিশ্বাস করতে হবে? অসম্ভব কিংবা অবিশ্বাস্য কিনা কংগ্রেসে তা প্রমাণ হলেও দ্বিধা যায় না। তাই প্যারিসে এবং লণ্ডনে নানা বিপরীত পরিস্থিতির সামনে পড়তে হয়েছিল জগদীশচন্দ্রকে। সে সময়ে দেশে রবীন্দ্রনাথকে সে-সব বিচিত্র অবস্থার কথা চিঠিতে জানাতেন। ভগিনী নিবেদিতাও তখন প্যারিস ও লণ্ডনে ভ্রমণরত ছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান-জগতে জগদীশচন্দ্র যে কি রকম আলোড়ন তুলেছেন সে কথা ভগিনী নিবেদিতাও লিখে জানাতেন রবীন্দ্রনাথকে।

লণ্ডনে

"......লণ্ডনে আসিয়াছি। একজন Physiologist (শারীরতত্ত্ববিদ) আমার কার্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, সে কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living (জীব ও জড়ের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য থাকতে পারে না)। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা

হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিয়াছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! (এসব জাদুবিদ্যা, এসব জাদুবিদ্যা)। তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted (স্বীকৃত) হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory (তত্ত্ব) পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন কোন physicists (পদার্থবিজ্ঞানী), কোন কোন chemists (রসায়নবিদ) এবং অধিকাংশ physiologists (শারীরতত্ত্ববিদ) আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory (তত্ত্ব) আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন। কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপতিত রহিয়াছে।"* এ থেকে তখনকার অবস্থা বেশ বোঝা যায়। বোঝা যায়, জগদীশচন্দ্র তখন একাকী, আর তাঁর প্রতিপক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দিক্‌পাল বিজ্ঞানীরা।

শিলাইদহ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রীঃ, রবীন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, "যুদ্ধ ঘোষণা করে দিন। কাউকে রেয়াৎ করবেন না— যে হতভাগ্য surrender না করবে, লর্ড রবার্টসের মত নির্মম চিত্তে তাদের পুরাতন ঘর-দুয়ার তর্কানলে জ্বালিয়ে দেবেন। তারপরে আপনি জয় করে এলে আপনার সেই বিজয় গৌরব আমরা বাঙ্গালীরা ভাগ করে নেব।"

এ সময় ব্র্যাডফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে (সেপ্টেম্বর, ১৯০০ খ্রীঃ) এক নিবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লজ উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ধরার যন্ত্রের কাজ নিয়ে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বিজ্ঞানী লজ-এর মতবিরোধ ছিল। ব্র্যাডফোর্ডে তাঁর বক্তৃতা শুনে লজ-এর ভুল ভাঙ্গে। তিনি জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে

* উদ্ধৃতিতে বন্ধনী দেওয়া বাংলা অংশ গ্রন্থকারের। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ৩১এ আগস্ট লণ্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের চিঠির অংশবিশেষ।

নির্দ্বিধায় একমত হন। জগদীশচন্দ্র যেসব পরীক্ষা-গবেষণা করে যাচ্ছেন তার জন্যে প্রচুর টাকার দরকার। বিজ্ঞানী লজ আগ্রহ নিয়ে জানতে চান, জগদীশচন্দ্রের যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা।

কিছু দিন বাদে অধ্যাপক ব্যারেট তাঁকে ইংল্যাণ্ডে থেকে গবেষণার কাজ চালাবার প্রস্তাব দেন। এর জন্যে বিজ্ঞানী লজ এবং তিনি জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত একটি অধ্যাপনার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে কথা দেন। জগদীশচন্দ্র রাজি হন নি। তাঁর এক বন্ধুকে এ বিষয়ে লিখেছিলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও, তিনিও মনে করেন, তাঁর গবেষণার কাজ অনেক সহজ হবে যদি তিনি ইংল্যাণ্ডে থেকে যান। রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "আমার সমস্ত inspiration-এর (প্রেরণার) মূলে আমার স্বদেশীয় লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?"

ব্র্যাডফোর্ডে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে 'জড় পদার্থের প্রাণ স্পন্দন' নিয়ে জগদীশচন্দ্র যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেটি 'ইলেক্ট্রিশিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁর গবেষণা বিষয়ে প্রশংসাও করা হয়। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের মত মেনে নিতে রাজি হলেন না। তিনি এবার তাঁর মতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলেন।

বিদেশে অবিরাম অস্থিরতার মধ্যে চলতে চলতে জগদীশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় দু'মাস তাঁকে বিশ্রাম নিতে হয়। ডাক্তার ক্রম্‌বি তাঁকে পরীক্ষা করে বোঝেন আভ্যন্তরীণ কঠিন রোগ, অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। মিসেস ওলেবুল তখন ইতালিতে ছিলেন। খবর পেয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে জগদীশচন্দ্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। ১১ই ডিসেম্বর অস্ত্রোপচার হয়। লেডি অবলা বসু এবং মিসেস্ ওলেবুলের সেবাশুশ্রূষায় জগদীশচন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁর এই অসুস্থতার সময় রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশন থেকে এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ করা হয়। স্থির করেন 'ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা' বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেবেন।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বক্তৃতা দিতে হবে রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে। জগদীশচন্দ্রের ছুটি তার আগেই শেষ হবে।

ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করলেন ছুটির জন্যে। আরও ছ'মাসের ছুটি মঞ্জুর হল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাই এখন আবার আগের পরিকল্পনা মতো কাজে নেমে গেলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড র‍্যালে এবং স্যার জেমস্ ডেওয়ার তাঁকে বিখ্যাত ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে কাজ করতে অহ্বান করেন। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ছাড়া এরূপ আহ্বান কাউকে করা হত না। এখানে তিনি নিশ্চিত প্রমাণ করেন যে, বাইরের উত্তেজনায় প্রাণী ও জড়ের সাড়া মূলত এক।

জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী বাইরের উত্তেজনায় যে সাড়া দেয় তাতে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন জগদীশচন্দ্র। এ হল ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনা। জীব ও জড়ের পরে এবার উদ্ভিদ সম্পর্কে নতুন ভাবনা-চিন্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউসনের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য অধিবেশনে (১০ই মে, ১৯০১ খ্রীঃ) এক প্রদর্শনী-বক্তৃতায় পরীক্ষাসহ জগদীশচন্দ্র দেখালেন, প্রাণী ও জড়ের সাড়া-লিপির ভঙ্গি একই। প্রাণী ও জড়ের ওপরে বিষক্রিয়ায় বা ক্লান্তিতে, বা উত্তেজনায় যে একই রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তা তিনি দেখান তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে সাড়ালিপি উৎকীর্ণ করে। উপস্থিত বিজ্ঞানীরা চোখের সামনে যেন দৈব ঘটনা দেখছেন, এমনি তাঁদের অবস্থা। জগদীশচন্দ্রের জিজ্ঞাসা ছিল, 'প্রাণী ও জড়ের প্রকৃতির মধ্যে যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে, যন্ত্রের সাড়ালিপি কি তারই আভাস দেয় না?'

ব্রিটিশ মিন্টের প্রধান স্যার রবার্ট অস্টেন। বিখ্যাত ধাতু-বিশেষজ্ঞ। সারাজীবন ধাতুর গুণাগুণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তিনি এসেছিলেন জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে। বক্তৃতা শেষ হলে তিনি আবেগকম্পিত স্বরে বলেছিলেন, "ধাতুর গুণ ও প্রকৃতি নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করছি, আমার আনন্দ হচ্ছে এ ভেবে যে, তাদেরও প্রাণ আছে।" জগদীশচন্দ্রকে তিনি তাঁর বাড়িতে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করেন। তাঁকে তিনি তাঁর প্রাণের কথা খোলাখুলি বলেন। তিনি বলেছিলেন, তিরিশ বছর ধরে ধা[illegible] গুণ ও প্রকৃতি নিয়ে তিনিও জগদীশচন্দ্রের মতো একটা ধার[illegible] পৌঁছেছেন। কিন্তু রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে তাঁর ধারণার কি[illegible]

আভাস দিতেই সকলে তা হেসে উড়িয়ে দেয়। তিনি আর তাঁর ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে ভর্সা পান নি। জগদীশ-চন্দ্রের বক্তৃতা শুনে এবং হাতে-কলমে পরীক্ষা দেখে তাঁর মনে খুবই উৎসাহ জেগেছে। তিনি জগদীশচন্দ্রের সাহস এবং নির্ভুল যুক্তির প্রশংসা করেন। তিনি অকপটে বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি এখন সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত।

এ সময়ে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার নিয়ে নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রধানত বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে মানুক বা না মানুক, হেসে উড়িয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু দু'চারটি সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্র মাঝে মাঝেই জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মক টীকা-টিপ্পনী ছুঁড়তে শুরু করে। 'দি গ্লোব' কটাক্ষ করে লিখে, বক্তৃতার সময়ে পরীক্ষা দেখাতে গিয়ে অধ্যাপক যখন বিভিন্ন ধাতুতে আঘাত করতে বাধ্য হন, তখন তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। তিনি যে ধাতুদের সমব্যথী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রিটেনে গৃহিণীদের ধাতুদের ব্যথা-বেদনা বোঝাতে সময় লাগবে। তাঁর আবিষ্কার সেদিন সার্থক হবে যেদিন দেখা যাবে, রান্না করার চিমটা-সাঁড়াশী গনগনে উনোনের পাশে পড়ে গেলে গৃহিণীরা হায় হায় করে বুকে তুলে নেবে। জগদীশচন্দ্রও নির্বোধ বেরসিক নন। এর জবাবে তিনি বেশ রসিয়েই বলেছিলেন, এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন না যে, প্রবল পরাক্রমশালী 'জন বুল' (ইংরেজ জাতি) সামান্য একটি ধাতুখণ্ডের পতনে শোকাভিভূত হবে।

প্রতিকূল বায়ু

ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা তখন শ্রেণীবিরোধে অন্ধ। তাঁরা বিজ্ঞানকে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার সীমার ভিত্তিতে দেখেন। পদার্থ-বিজ্ঞানী শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে উদাসীন, রসায়ন বিজ্ঞানী পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কে উদাসীন—এমনি অবস্থা চলছে তখন ইংল্যাণ্ডে। বিজ্ঞানের যে প্রতি শাখার সঙ্গে অন্যান্য প্রতিটি শাখার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এ তাঁরা বুঝতে চাইতেন না। আর এ কারণেই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে তাঁরা অনেকে সন্দেহের চোখে

দেখতে থাকেন। বিদেশী বিজ্ঞানীরা জানতেন, জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের নানান ধর্ম সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা করেছেন, উন্নত ধরনের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা জানতেন, জগদীশচন্দ্র একজন পদার্থবিজ্ঞানী। সে বিষয়ে তাঁর প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তিনি প্যারিস কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউশনে যে বিষয়ের অবতারণা করেন, তা প্রধানত জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং তাঁদের অনেকের মত, একজন পদার্থবিজ্ঞানীর পক্ষে তাঁর বৃত্তের বাইরের বিষয়ে কোনও তথ্য নির্ধারণ করা অসম্ভব।

রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কার নিয়ে পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতার খসড়া-লিপি সোসাইটিতে দাখিল করা হয়েছে। শারীরবিজ্ঞানীরা ক্ষেপে উঠলেন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা-সভায় প্রতিবাদের ঝড় তোলার জন্যে তৈরি হলেন। এঁদের প্রধান ছিলেন বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্তবিদ্ প্রবীণ বিজ্ঞানী স্যার বার্ডন স্যাণ্ডারসন। সেই সঙ্গে আছেন বিখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী ডক্টর ওয়ালার তাঁর দলবলসহ। ডক্টর ওয়ালার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক আগে থেকেই বিরূপ মত পোষণ করতেন।

৬ই জুন, ১৯০১ খ্রীস্টাব্দ। রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শোনার জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এসেছেন। এসেছেন স্যার স্যাণ্ডাসন, ডক্টর ওয়ালার এবং তাঁদের সমর্থকরা। স্যার স্যাণ্ডারসন বক্তৃতা-সভায় মন্তব্য করলেন, পদার্থের অনুভূতি ব্যাপারটা শারীরবিজ্ঞানের বিষয়। জগদীশচন্দ্র তাতে অনধিকারী। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন এবং একের পর এক তাঁর সিদ্ধান্ত যন্ত্রসহযোগে প্রমাণ করতে থাকলেন, তখন দেখা গেল স্যার স্যাণ্ডারসন প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। বক্তৃতা শেষে তিনি জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালেন।

জগদীশচন্দ্র স্পষ্ট বুঝলেন, তিনি যে-সত্য নিশ্চিতরূপে আবিষ্কার করেছেন, এই দুই খ্যাতিমান শারীরবিজ্ঞানী তা সহজে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। স্যার স্যাণ্ডারসন আর ডক্টর ওয়ালার-এর আত্মাভিমান সহজে দূর হবার নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন,

"এবার শারীরবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমার প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হবে। কিন্তু সব সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিনের অনলস প্রয়াস। স্যাণ্ডারসন শারীরবিজ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য—সবাই তাঁর কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবে। কিন্তু একাকী সংগ্রাম করার জন্যে, যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন, তারও অভাব হবে না।"

লণ্ডনে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা বাধা পাচ্ছে। তিনি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে উদ্বেগ ও বিষণ্ণতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই ছাড়া গতি নেই। সবই বুঝতে পারছেন। নিজের মানসিক অস্থিরতার কথা লিখলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "বাধা যতই গুরুতর হউক তুমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না করিয়া তোমার নিষ্কৃতি নাই। সে জন্য যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে করিতে হইবে।" দেশ থেকে অনবরত তাঁকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। কেবল পত্র লিখে কথার প্রেরণাই নয়, স্বদেশে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তিনি তখন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করছেন, কবিতায় প্রশস্তি জ্ঞাপন করছেন। দেশের মানুষ যাতে তাঁর কথা জানে, তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণার গুরুত্ব বুঝতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সে চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবে।

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, জগদীশচন্দ্র যে-সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন তা ব্যক্তিগত খ্যাতি প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়। সে সত্য প্রকাশে ব্যক্তির চেয়ে দেশের মহিমাই বাড়বে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখেছিলেন, "তুমি যাহা দেখিতে পাইয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক মায়া-মরীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধামাত্র নাই। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবে।" তিনি অনুভব করেছিলেন, বিশ্বে ভারতের উপলব্ধি প্রকাশের যে সুযোগ জগদীশচন্দ্র মারফৎ এসেছে তার সার্থক প্রয়োগে হেলাফেলা বা ভয়ভীতি, কোনটাই চলবে না।

জগদীশচন্দ্রের মনের অবস্থা প্রকাশ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে লেখা তখনকার এক চিঠিতে। তিনি লিখেছিলেন, "……এই

বিদেশে থাকিয়া দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাত রাজ্য। আমি একাকী পথ খুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত……। তোমার স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়……মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহ বাক্যে আমাকে পুনর্জীবিত করিও।”

রয়্যাল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্র যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেটি সোসাইটিতে গৃহীত হলেও তাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হল না। কারণ স্বরূপ বলা হল, শারীরতত্ত্ববিদ সদস্যগণের অনেকেই তাঁর আবিষ্কারের সত্যতা মেনে নিতে পারছেন না। এতে তাঁর মন ভেঙ্গে পড়ে। কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর বিরোধিতা তাঁর গবেষণার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। তাঁর খ্যাতি, তাঁর সব আশা ম্লান হয়ে যাবার পথে। গবেষণার যে সামান্য সুযোগ-সুবিধা তাঁর জুটেছিল, তাও বন্ধ হবে। এদিকে বিদেশে থাকার সময়ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কী করবেন ভেবে অস্থির হয়ে পড়েন। ইংল্যাণ্ডে থাকলে প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি ছাড়তে হবে। নয়তো, কাজ শেষ না হতেই দেশে ফিরে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, কাজ শেষ না করে দেশে ফেরা চলবে না।

পুনরুজ্জীবন

ছুটির জন্যে আবেদন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। মঞ্জুর হল না। কিছুদিনের জন্যে কম বেতনে সাময়িক ছুটি যাতে মঞ্জুর হয় তার আবেদন করলেন। সে আবেদন মঞ্জুর হল। কিন্তু বিদেশে আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে কি করে? রবীন্দ্রনাথকে সমস্যার কথা লিখতেই তিনি ত্রিপুরার মহারাজাকে সব জানিয়ে আর্থিক সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন। বিদেশে জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে এলেন ত্রিপুরার মহারাজা। এবার তাঁর সব দুশ্চিন্তা দূর হল। নতুন উদ্যোগে আবার গবেষণার কাজে মেতে উঠলেন।

খ্যাতিমান উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক ভাইন্‌স্ তখন লিনিয়ান সোসাইটির সভাপতি, আর অধ্যাপক হাউয়েস সম্পাদক। তাঁরা লণ্ডনে জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-কাজ দেখতে আসেন। উদ্ভিদের দেহে

উত্তেজনার সূচনা হলে গ্যালভানোমিটারে তার আন্দোলন দেখে তাঁরা উভয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। রয়্যাল সোসাইটি তাঁর যে নিবন্ধটি প্রকাশ বন্ধ রেখেছিল, এঁরা দু'জন সেটি লিনিয়ান সোসাইটিতে পাঠাতে অনুরোধ করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই লিনিয়ান সোসাইটিতে তাঁর সমস্ত আবিষ্কার হাতে-কলমে প্রদর্শনের জন্যে আমন্ত্রণ আসে। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ মার্চ সেখানে তিনি বক্তৃতাসহ নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে তাঁর আবিষ্কারের সত্যতার প্রমাণ প্রদর্শন করেন। পশ্চিমের বিজ্ঞানীরা তা দেখে অভিভূত হন। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের সত্যতা ও গভীরতা অনুভব করেন। তাঁর প্রতি এসব বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত। স্যার স্যাণ্ডারসন এবং ডক্টর ওয়ালারও লিনিয়ান সোসাইটির সভায় উপস্থিত ছিলেন। জগদীশ-চন্দ্রের প্রতি অন্য সকল বিজ্ঞানীর স্বীকৃতি দেখে তাঁরা আর সাড়া দেন নি।

রয়্যাল সোসাইটির তুলনায় লিনিয়ান সোসাইটির সম্মেলন ছিল অনেক বড়। জগদীশচন্দ্র এখানে তাঁর মৌলিক গবেষণা প্রদর্শন করে বিজ্ঞান-জগতে আশাতীত স্বীকৃতি লাভ করেন। এতে তিনি নতুন করে উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন।

উদ্ভিদ-দেহের সংবেদনশীলতা নিয়ে অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌-এর কোনও দ্বিধা নেই। তিনি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। কিন্তু লিনিয়ান সোসাইটির মুখপত্রে জগদীশচন্দ্রের নিবন্ধ প্রকাশে তবু বাধা দেখা দিল। রয়্যাল সোসাইটিতে নিবন্ধটি পাঠ করার আট মাস পরে ডক্টর ওয়ালার-এর নামে সেটি লণ্ডনের এক বিজ্ঞান-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই জন্যে ডক্টর ওয়ালার-এর সমর্থকরা সে নিবন্ধ লিনিয়ান সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশে বাধা দেয়। অবশেষে যখন সত্য প্রমাণিত হয় তখন নিবন্ধটি লিনিয়ান সোসাইটির কাগজে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ভাইন্‌স্‌-এর বিজ্ঞানী-সুলভ সহৃদয়তাই জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানীর বিরোধিতা ও বিরূপ মনোভাবকে উপেক্ষা করার সাহস জুগিয়েছিল।

প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ

জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থের নাম 'Response in the Living

and Non-Living'। বাংলায় বলা যায় 'জীব ও জড়ের সাড়া'। প্রকাশ করে লণ্ডনের লংম্যান, গ্রীন অ্যাণ্ড কোম্পানী। প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। গ্রন্থটি প্রকাশের মূলে তাঁর একটি বিশেষ মনোভাব ছিল। ইংল্যাণ্ডে তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারে তিনি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাতে তিনি বুঝেছিলেন, গবেষণার কথা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করাই সহজ। কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা মতামতের ধার ধারতে হবে না, কারো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কূট বিতর্কে জড়াতে হবে না। দেখা গেল, তাঁর ধারণা মিথ্যা নয়। বইটি বেরোবার পরে বিজ্ঞানী-মহলে নতুন করে সাড়া উঠল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা অযাচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করল বিজ্ঞানীর উদ্দেশ্যে। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার, প্রিন্স ক্রোপেটকিন, অধ্যাপক কারভেল রিড তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্মানিত করলেন জগদীশচন্দ্রকে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় তিনি যেসব নতুন পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন সেসব নিয়ে একটি নিবন্ধ রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠান। কোন সমালোচনার মধ্যে না গিয়ে সোসাইটি সে নিবন্ধ প্রকাশ করে। জগদীশচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ শুধু নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্যই নয়, তাঁর তথ্য প্রকাশের ভাষায় সাহিত্যগুণের জন্যেও সেটি একটি সম্পদ বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

ঘরে ফেরার আগে

দেশে ফেরার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তার আগে বেলফাস্ট, জার্মেনি প্রভৃতি স্থানে তাঁকে যেতে হয়। এসব জায়গায় বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। সেসব প্রতিষ্ঠানে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র। 'জড় ও জীবের সাড়ার অভিন্নতা' বিষয়টি সকলকে চমকিত করে। বিজ্ঞানীরা তাঁর আবিষ্কারের মৌলিকতা শুধু স্বীকারই করেন না, মহৎ বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধাও জানান আন্তরিকতার সঙ্গে। রয়্যাল ফটোগ্রাফি সোসাইটির পত্রিকায় ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এ সময়ে। ফটোগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর নতুন তত্ত্ব নিয়েও পরে এখানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়।

ইতিপূর্বে রয়্যাল সোসাইটি তাঁর গবেষণা-তত্ত্ব বিষয়ে উপেক্ষা এবং

প্রত্যাখ্যান কম করে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক ব্যবহারও করতে দ্বিধা করে নি। কিন্তু এ সময়ে যখন চতুর্দিকে তাঁর আবিষ্কার নিয়ে সাড়া উঠল, তাঁর তথ্যকে স্বীকৃতি জানাতে থাকল নানা দেশের বিজ্ঞানীরা, তখন রয়্যাল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের যাবতীয় বিতর্কিত ও উপেক্ষিত নিবন্ধ প্রকাশের জন্যে আগ্রহ দেখায়। লিনিয়ান সোসাইটি প্রথম থেকেই তাঁর সম্পর্কে শুধু আগ্রহ দেখায় নি, সহযোগিতাও করেছে তাঁর গবেষণার কাজে। এখন এই উভয় সংস্থার মুখপত্রে একযোগে প্রকাশ হতে থাকল জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন গবেষণা-নিবন্ধ।

ঘরে ফিরে

ইউরোপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দেশে ফিরে এলেন জগদীশচন্দ্র। লর্ড কার্জনের আমল তখন। সারা দেশে একটা নতুন রাজনৈতিক চেতনার সাড়া দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথও দেশের সে নব-চেতনায় অনেকটা যুক্ত। ইংল্যাণ্ডে জগদীশচন্দ্রের তিক্ত অভিজ্ঞতাও ভোলার নয়। লেডি অবলা বসু তাঁর বিদেশের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এক জাগয়ায় বলেছেন যে, আমাদের দেশে সাহেবদের সম্পর্কে যে উচ্চ ও সশ্রদ্ধ ধারণা, তাদের দেশে না গেলে সেটা যে কত বড় ভুল তা বোঝা যাবে না। সাহেবদের মধ্যেও যে বিদ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা কত ভয়ানক হতে পরে, তা দেখা গেছে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ও গবেষণা প্রসঙ্গে তাদের নানারূপ হীন অপচেষ্টার মধ্যে। শেষ পর্যন্ত নিজের অসীম ধৈর্য, সাহস ও দুর্জয় মনোবলের দ্বারা তিনি তাঁর গবেষণা-লব্ধ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেই দেশে ফিরে এসেছিলেন।

১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সপ্তম এড্‌ওয়াড-এর অভিষেক উপলক্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সি. আই. ই. উপাধি দেন। বলা হয়, বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের জন্যে এই স্বীকৃতি-সম্মান। জগদীশচন্দ্র সে খবর পেয়ে সরস বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন, 'আজ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে।' জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিতে সরকারী খেতাব একটি পুচ্ছ বা ল্যাজ ছাড়া কিছু নয়।

ডিসেম্বর মাসে ভারত সঙ্গীত-সমাজ জগদীশচন্দ্রকে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কোচবিহারের মহারাজা। রবীন্দ্রনাথ এ অনুষ্ঠানের জন্য 'জয় তব হোক জয়' গানটি রচনা করেন।

এবার পদার্থবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞানের সমন্বয়ে জীব ও জড় জগতের তথ্য অনুসন্ধানের পালা। উদ্ভিদের শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু হল। নির্বাক উদ্ভিদের প্রাণলীলা

অবলা বসু

পর্যবেক্ষণের সূত্র আবিষ্কারের সাধনা আরম্ভ করলেন জগদীশচন্দ্র। উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দনলিপি যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহণ করে দেখলেন, প্রাণিদেহের স্পন্দনের সঙ্গে তার অমিল কিছু নেই।

তাঁর গবেষণার ফলাফল কয়েকটি নিবন্ধাকারে রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন তিনি। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা এটা। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ সে নিবন্ধ সব প্রকাশ করবেন বলে জানালেন। কিন্তু এবারও বাধা এল। জীববিজ্ঞানীরা জগদীশ-চন্দ্রের সিদ্ধান্তে একমত নন। সোসাইটি থেকে জানানো হল, যেহেতু

জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলাফল অপ্রত্যাশিত, এবং প্রচলিত ধারণার বিরোধী, জীববিজ্ঞানীরা তা মেনে নিতে পারছেন না। তাই তাঁর সব নিবন্ধ প্রকাশ করা স্থগিত রাখা হয়েছে।

আরও উনিশটি গবেষণামূলক নিবন্ধ তৈরি। প্রকাশের পথ বন্ধ। তাঁর গবেষনালব্ধ তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে কোন কোন বিজ্ঞানী তখনও সন্দেহ করেন। কেউ কেউ সে সত্য অস্বীকার করতে না পারলেও দ্বিধাগ্রস্ত। জগদীশচন্দ্র বিচলিত হলেন। এর মধ্যেই বুদ্ধগয়া ঘুরে এলেন। সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য যদুনাথ সরকার, স্বামী শঙ্করানন্দ প্রভৃতি খ্যাতিমান ব্যক্তিরা।

নিজের বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন থাকলেও তিনি দেশের সমকালীন সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন নি কখনো। দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর বরাবর। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার দেশে। অক্টোবর মাসে 'কার্লাইল সার্কুলার' রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রদের যুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ করল। প্রতিবাদ উঠল দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের কণ্ঠে। পরিকল্পনা হল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের। জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব দিলেন ফেডারেশন হলের। দেশের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হবে সেখানে। স্বদেশের শিল্প-বিজ্ঞান-সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন-ইতিহাস—সব কিছু নিয়ে চর্চা হবে। সেটি হবে বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্র, জ্ঞানের আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্র। এ পরিকল্পনা জগদীশচন্দ্রের। শুধু বিজ্ঞানের আবিষ্কার নয়, দেশকেও নতুন করে আবিষ্কারের কথা ভেবেছিলেন জগদীশচন্দ্র।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় গ্রন্থ Plant's Response as a means of Physiological Investigation। তৃতীয় গ্রন্থ Comparative Electrophysiology প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে। দুটি গ্রন্থই প্রকাশ করে বিলাতের লংম্যান কোম্পানী। উদ্ভিদ-জীবনের অব্যক্ত-অদৃশ্য ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিচিত্র বার্তাবহ এ বই দুখানি বিশ্ব-বিজ্ঞান সমাজকে সন্ধান দিল বিশ্বরহস্যের এক নতুন দিগন্তের। সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলল জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সে নতুন বার্তা।

ইউরোপের দেশে দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আর বিজ্ঞান-গবেষণাগারে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রে ও প্রক্রিয়ায় শুরু হল

পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রুশ, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গ্রন্থ দুখানি অনুবাদের প্রস্তাব এল। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা লিখল, "রাজনৈতিক আন্দোলনের নায়ক হিসেবে বাংলাদেশ যখন মানুষের কাছে পরিচিত, তখন অধ্যাপক বসুর দুখানি গ্রন্থ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, বাঙ্গালীর প্রতিভা মহৎ কাজে ব্রতী।"

এ বছরই রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্য প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্রে কবি বিজ্ঞানীকে লিখলেন, 'সত্যরত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার/ কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।'

তৃতীয় যাত্রা

দেশে ফেরার পর বছর তিনেকের মধ্যে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা তাঁর পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হবার কথা জানান। জগদীশচন্দ্র তাই আবার বিদেশ যাত্রায় উদ্যোগী হন। সারা পৃথিবীতে তখন তাঁর আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর সম্পর্কে বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে মহাবিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। দেশের সরকার তা জানতেন। তাই জগদীশচন্দ্রের এক আবেদনে তাঁর গবেষণার জন্যে অর্থসাহায্যের কথা বিবেচনা করে সরকার শিক্ষা-বিভাগে তাঁর পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি করেন। দেশীয় সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও জগদীশচন্দ্রকে অর্থসাহায্য করার সমর্থনে প্রচুর লেখালেখি করে।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে বিদেশ-ভ্রমণের জন্যে এক বছরের ছুটি মঞ্জুর হল। বিদেশে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতির কথা স্মরণ করে সরকারই তাঁকে ডেপুটেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় বিজ্ঞান মিশন নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন জগদীশচন্দ্র। ইউরোপ যাত্রার পথে বোম্বাই পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসুর সহযাত্রী ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। জার্মেনী হয়ে নভেম্বর মাসে পৌঁছলেন লণ্ডনে। তখন ভগিনী নিবেদিতাও লণ্ডনে ছিলেন। সেখানে ভগিনীর সঙ্গে দেখা হয় তাঁদের। ইংল্যাণ্ডের নানা স্থানে বিশেষ ঘোরাফেরা এ যাত্রায় সম্ভব ছিল না। এ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। কিন্তু

তবুও তাঁর আবিষ্কারের পরীক্ষা দেখানো এবং সে সম্পর্কে বক্তৃতা করতে হয় বহু স্থানে। এবার আর বিশেষ কোনও বিরোধের বাধা পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে নি।

আমেরিকায়

জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় আসেন ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। আমেরিকায় তাঁর এই প্রথম যাত্রা। কিন্তু সে দেশের বিজ্ঞানী-মহল তাঁর সম্পর্কে নির্ভুল খবর রাখতেন অনেক আগে থেকেই। বহুদিন ধরেই আমেরিকার বিজ্ঞানীদের ছিল জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে সশ্রদ্ধ বিস্ময়। তাই বিজ্ঞানীকে কাছে পেয়ে তাঁরা আপ্যায়িত করলেন আন্তরিক ভাবে।

আমেরিকায় জগদীশচন্দ্র

দেশের প্রায় সব জায়গা থেকে তাঁর আমন্ত্রণ এল। কিন্তু সব জায়গাতেই যাবার সময় ছিল না। তবুও ইলিনয়, অ্যান আর্বর, উইসকনসিন, শিকাগো, বোস্টন, বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন প্রভৃতি জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান একাডেমি, মেডিক্যাল সোসাইটি, বটানিক্যাল সোসাইটি ইত্যাদি সংস্থায় তিনি বক্তৃতা

দেন, পরীক্ষা দেখান। এসব স্থানে সাধারণ মানুষ থেকে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সবাই তাঁকে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দন জানায়।

বিবেকানন্দের শিষ্যা ওলে বুল ছিলেন আমেরিকার এক ধনী মহিলা। ইতিপূর্বে ভারত ভ্রমণে এসে বসুদম্পতির সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়েছিল। আমেরিকাতে যখন তাঁরা ভ্রমণরত তখন এই বৃদ্ধা মহিলা তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেন। এই বৃদ্ধার বাড়িতে কিছুদিন তাঁরা থাকেনও। তিনি জগদীশচন্দ্র এবং অবলা বসুকে নিজের সন্তানের মতো আদর-যত্ন করেন।

তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ জগদীশচন্দ্রের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ভ্রমণের সময়ই বিজ্ঞানে তাঁর স্বকীয় অবদান ইউরোপ ও আমেরিকাতে সকলের স্বীকৃতি লাভ করে। এ যাত্রাতেই তিনি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানজগতে একজন সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানীর সম্মান লাভ করেন। আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সংস্থা, বিজ্ঞানী এবং জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে শুধু মুগ্ধই হন নি, তাঁকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন দিয়ে সম্মানিতও করেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে দেশে ফিরে আসেন জগদীশচন্দ্র। এবার ফেরার পথে সঙ্গে ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। বোম্বাই এসে তিনি চলে যান মাদ্রাজে, আর বসুদম্পতি ফেরেন কলকাতা।

দেশের মাটিতে

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রায় সব তীর্থস্থান দর্শন করেছেন। হিমালয়ের বহু দুর্গম স্থানেও কয়েকবার করে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিজ্ঞানীর মন নিয়ে সব দেখেছেন, দার্শনিক-সুলভ মানবিক শুভবোধ নিয়ে সব অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। বাকী ছিল কেদারবদরী। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে সস্ত্রীক সে ভারত-তীর্থও ঘুরে এলেন ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটিতে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-চিন্তায় যত বেশী মগ্ন হয়েছেন, গবেষণার নতুন নতুন ধারায় যত বেশী নিজেকে সমর্পণ করেছেন, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ রহস্য থেকে জড়-জীব-উদ্ভিদ-জীবনের রহস্যের যত বেশী গভীরে প্রবেশ করেছেন, ততই তাঁকে দেখা গেছে নিজের দেশের প্রতি, দেশের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি সমধিক

আকৃষ্ট হতে। যত তাঁর কর্মপ্রেরণা বেড়েছে, যত তিনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত হয়েছেন ততই যেন দেশের মাটির টান অনুভব করেছেন অপ্রতিরোধ্য ভাবে। তাই, তাঁর জীবনে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, যখনই সময়-সুযোগ ঘটেছে, যখনই অবকাশ এসেছে, তখনই তিনি দেশের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

তখনকার দিনে কেদারবদরী দর্শন ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। হিমালয় থেকে গঙ্গা নেমে এসে সমতলের মাটি ছুঁয়েছে হরিদ্বারে। সেখান থেকে কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ঘোড়া বা ঐ জাতীয় বাহনের পিঠে চেপে প্রায় একমাস সময় লেগে যেত কেদারবদরী যেতে। তীর্থস্থানের চেয়ে বোধ হয় এ যাত্রায় বড় আকর্ষণ হিমালয় আর পুণ্যকামী বিচিত্র সব নরনারীর যাত্রাস্রোত। তখন এ ধরনের ভ্রমণে শ্রম-ক্লান্তি আর দুর্ভোগ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য এমনই যে, যাত্রীদের কাছে পথের কষ্ট তুচ্ছ মনে হতে সময় লাগে না। জগদীশচন্দ্রের বেলায় তো তা আরো বেশি করে স্বাভাবিক। হিমালয় ছিল তাঁর প্রেরণার এক বড় উৎস।
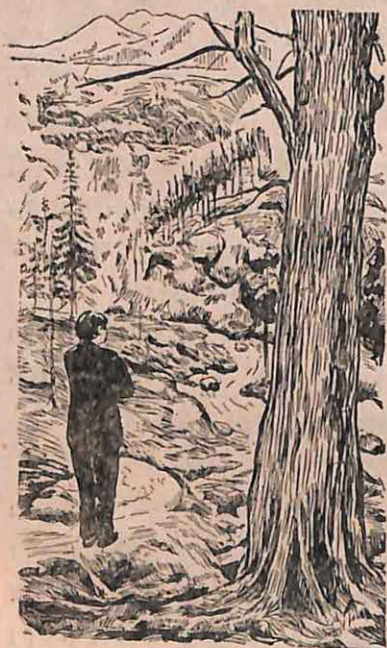
হিমালয় ছিল তাঁর প্রেরণায় উৎস

তাঁর ভ্রমণ-চরিত্রের স্বরূপ সারা দেশের অনেকেই জানতেন। একবার শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে দেবমূর্তি দর্শন করতে গিয়ে বলেন, তিনি সনাতন হিন্দু নন, সব কিছুর সংস্কারে বিশ্বাসী। পুরোহিতরা তাতে অখুশি না হয়ে তাঁকে জানায়, তিনি তো সাধু মানুষ। সাধুদের

জন্যে মন্দিরের দ্বার সব সময়ই খোলা। তাঁদের বেলায় নিয়ম-রীতি মানার প্রশ্ন আসে না।

ময়মনসিংহ শহর জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থান। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হয় সেখানে। অধিবেশনের সভাপতি মনোনীত হন জগদীশচন্দ্র। সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ তাঁকে জানান, এ উপলক্ষে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা শোনার জন্যে সে অঞ্চলের মানুষ খুবই আগ্রহী। তিনি যেন সে ভাবে তৈরি হয়ে আসেন। জগদীশচন্দ্র সে প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু সম্মেলনের কয়েক দিন আগে তাঁকে জানানো হয়, বক্তৃতা শোনার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হবে। তাই বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশমূল্য বা টিকিটের ব্যবস্থা করা দরকার। জগদীশচন্দ্র তা শুনে স্পষ্ট জানালেন, ময়মনসিংহ জমিদার প্রধান স্থান। টিকিট কেটে বক্তৃতা শোনার মানুষ সেখানে অনেক আছে। কিন্তু দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অনেকেই আর্থিক কারণে তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে পাবে না। তিনি তা চান না। দরকার হলে তিনি দু'দিন বক্তৃতা দেবেন। তাঁর এ প্রস্তাব অনুসারে একদিন বাংলায়, আর একদিন ইংরেজিতে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়।

সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, দিক্‌পাল কোনও সাহিত্যিক নন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র যে একজন সাহিত্যিকও ছিলেন, সে কথা বোঝা যায় তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি পাঠ করলে। বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর যে-সমস্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয় সেগুলো একত্র করে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে সাহিত্য রচনার বা সৃষ্টির যে একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তা এ গ্রন্থের যে-কোনও রচনায় বিকশিত। যদিও এ গ্রন্থে বিজ্ঞান-বিষয়ে রচনাই বেশি। কিন্তু তাতেও তাঁর ভাব প্রকাশ করার সাহিত্যগুণ অসাধারণ। আরও একটা দিকও লক্ষ্য করার মতো। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান-বিষয়ে এমন সাহিত্য-রসসমৃদ্ধ রচনাও এর পূর্বে বা পরে তাঁর মতো আর কেউ এমন নিপুণ ভাবে পরিবেশন করতে পারেন নি। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের

সাধনাকে তিনি মানুষের সাধনার এবং আত্মপ্রকাশের দুটি পথ বলেই মনে করতেন। এই সাহিত্য-সম্মিলনীর ভাষণে তিনি সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁর ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য, প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে আরো দুটি বড় ঘটনা ব্যক্তিজীবনে জগদীশ-চন্দ্রকে একদিকে শোকাভিভূত করে, আর অন্যদিকে রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত করে। ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করেন নিবেদিতা। সে দিনটি সারা ভারতের শোকের দিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু বসুদম্পতির বোধ হয় সে শোক অনেক ব্যাপক। তাঁদের জীবনে এ ঘটনা ছিল মর্মান্তিক। কেননা, ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তাঁদের সুখ-দুঃখের সমমর্মী। এ বছরই পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারত সরকার তাঁকে সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত করেন। এক দিকে নিবেদিতার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত তথা জাতীয় শোক, অন্যদিকে রাজকীয় সম্মান সেদিন বিজ্ঞানীকে জীবন ও মৃত্যুর বিচিত্র রহস্য-সন্ধানের দিকেই হয়তো আকৃষ্ট করেছিল বেশী করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি দেয় ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ। রামমোহন লাইব্রেরির সভাপতিও নির্বাচিত হন এ বছর। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই লাইব্রেরির

সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা কর্মোদ্যোগ পরিচালনা করেন। এখানে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় নানা বিষয়ে আলোচনা এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বিশেষ উপলক্ষে যাত্রাগান ও কথকতার আসর বসানো হতো এখানে। স্বদেশী সংস্কৃতির উজ্জীবনের নানা রকম প্রয়াস চলত এখানে। এ সবই হত তাঁর নির্দেশ ও প্রেরণায়। এ সব সত্ত্বেও তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা থামে নি বা ব্যাহত হয় নি। দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির দাবী মেনে নিয়েও বিজ্ঞানের সাধনায় তাঁর নব নব উদ্ভাবন চলছিল নিরন্তর। নানা কাজের মধ্যেও তিনি উদ্ভিদ-দেহের স্পন্দন লিপিবদ্ধ করার আরও উন্নত যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তৈরি করেন 'রেজোন্যান্ট রেকর্ডার', 'অসিলেটিং রেকর্ডার' প্রভৃতি যন্ত্র। এ সময়েই তিনি প্রাণিদেহের মতো উদ্ভিদ-দেহেও এক ধরনের স্নায়ুতন্ত্রের সন্ধান পান। সে সম্পর্কে তাঁর একটি নিবন্ধ রয়্যাল সোসাইটির 'ফিলজফিক্যাল ট্রানজেকশান' পত্রে প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে।

'পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্য ভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল।' রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে (১৯১৩) জগদীশচন্দ্র এ কথা লিখেছিলেন তাঁকে। ইতিপূর্বে তিনি যতবার বিদেশে গেছেন, তাঁর বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রচারের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের নবীন প্রতিভা রবীন্দ্র-নাথের কবিতা-গল্প প্রচারেও সমান প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বিদেশে তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। আবার সে দেশের কবি-সাহিত্যিকদের দিয়েও অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করেছেন। মনে হয়, সে সময়ে ভারতের এই দুই দিক্‌পাল প্রতিভা যেন আশ্চর্যভাবে উভয়ে উভয়কে চিনতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় সেদিন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জ্ঞাপন-সভার সভাপতিও ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে পঞ্চান্ন বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে জগদীশচন্দ্রের। সরকারী নিয়মে অবসর গ্রহণের বয়স। কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিভা ও অধ্যাপনা-কুশলতার কথা ভেবে চাকুরির মেয়াদ আরও দু'বছর বাড়িয়ে দেন। এ সময়ে লজ্জাবতী লতার স্নায়ুর স্পন্দন বিষয়ে এক

বক্তৃতার আয়োজন হয় কলকাতায়। তার সভাপতিত্ব করেন বাংলার লাটসাহেব লর্ড কারমাইকেল।

পৃথিবী-পর্যটন

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকারের উদ্যোগে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান মিশন নিয়ে আবার বিদেশ পাড়ি দেন। এবার পৃথিবীর প্রায় সব দেশে তাঁর আমন্ত্রণ। সঙ্গে নিয়েছেন ভারতের গাছ-গাছড়া লতাগুল্ম—লজ্জাবতীলতা, বনচাঁড়াল ইত্যাদি উদ্ভিদ আর স্ব-উদ্ভাবিত অধুনাতন যন্ত্রপাতি। এবারের সফরে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, টোকিও প্রভৃতি স্থানে জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষা দেখান। জগদীশচন্দ্রের ভাষায়, "......আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁহারা পরে আমার বান্ধব হইলেন।"

বোঝা যায়, এই সফরের সময়ও তাঁকে নানা বিরোধ-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আবার এক-আধটা ভয়ঙ্কর মজাদার ঘটনার সামনেও তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছিল। প্যারিসে পরীক্ষা দেখাচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয় 'বিষপ্রয়োগে গাছের মৃত্যু'। যন্ত্রে বনচাঁড়াল গাছের স্পন্দন লিপিবদ্ধ হচ্ছে। গাছটিতে পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগ করা হল। এ হল তীব্র বিষ। প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে গাছটি মরে যাবার কথা। দর্শক বিজ্ঞানীরা সবাই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু গাছে মৃত্যুর লক্ষণ কিছু দেখা গেল না। বিষ-প্রয়োগের মাত্রা বাড়ানো হল। তাতে দেখা গেল গাছের উদ্দীপনা বেড়ে যাচ্ছে। সভাশুদ্ধ গুঞ্জন শুরু হল। জগদীশচন্দ্র মুহূর্তকাল কী ভেবে নিয়ে ক্লোরোফর্মের শিশি থেকে কিছু ক্লোরোফর্ম ঢেলে দিলেন গাছের ওপরে। এবার গাছের চলন-শক্তি ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রয়োগের ফল এমন অস্বাভাবিক কি করে হতে পারে তাই নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। খোঁজখবর নিয়ে জানলেন, এক পরিচারিকা মহিলাকে বিষটি দোকান থেকে কিনে আনতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষ বিনা প্রমাণপত্রে বিক্রয় হয় না। মহিলাটি প্রমাণপত্র নিয়ে যান নি। তাই দোকানদারকে

এই তীব্র বিষটি দিতে বলায় সে ভাবে, মহিলা নিশ্চয় কোনও দুঃখে আত্মহত্যা করতে চান। তাই দোকানদার তাঁর সে বিপদের কথা ভেবে সহানুভূতির সঙ্গে গোপনে শিশিতে চিনির জল পুরে দেয়। একজন মহিলার প্রাণ রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্যেই দোকানদার এ কাজ করে। কিন্তু তার সে মহৎ মনোভাব যে পৃথিবীর এক মহা-বিজ্ঞানীর জীবনে কী বিপর্যয়ের সূচনা করেছিল, তা হয়তো সে দোকানদার কোনদিনই জানতে পারে নি।

এ যাত্রায় তিনি বিভিন্ন দেশে সর্বশ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় অভিনন্দিত হয়েছেন। দেশে দেশে বিজ্ঞানীরা তাঁর গবেষণার বিচিত্র বার্তায় অভিভূত হয়েছেন। সবশেষে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জাপান হয়ে ফিরে আসেন নিজের দেশে।

অধ্যাপনার অবসরে

একত্রিশ বছরের অধ্যাপনার জীবন সমাপ্ত হল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে। পৃথিবী ভ্রমণের পর দেশে ফিরে অবসর পেলেন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়লেন না। অবৈতনিক অধ্যাপক হিসেবে সসম্মানে তাঁকে যুক্ত রাখলেন কলেজের সঙ্গে। কলেজের গবেষণা-গারে অবাধ হল তাঁর গবেষণা। ভারত সরকার বার্ষিক এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন তাঁর গবেষণার সাহায্যের জন্য। লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসময়ে তাঁকে দেওয়া হয় বিশেষ সম্মানসূচক সম্বর্ধনা আর এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় দেয় এল. এল. ডি. উপাধি। তাঁর পৈত্রিক বাসভূমি বিক্রমপুর থেকেও এ সময়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করা হয় সেখানকার বিক্রমপুর সম্মিলনীর পক্ষ থেকে। এই সম্বর্ধনা সভায় তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সেটি আছে 'বোধন' নামে।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন লক্ষ্ণৌ-এ। জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিলেন 'অদৃশ্য আলোক' নিয়ে। পরে এ বক্তৃতাটি 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংযোজিত হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর বাল্যজীবনের স্মৃতিবিজড়িত ফরিদপুর শিল্প প্রদর্শনীতেও বক্তৃতা দেন এই বছর। এ বছরই লাভ করেন নাইট

উপাধি। এ উপলক্ষে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও তাঁকে অভিনন্দন জানায় এই একই বছরে।

সম্মান-খ্যাতির উর্ধ্বে আরও বড় দুটি কারণে এ বছরটি স্মরণীয়। বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এবং তাঁর অন্যতম প্রধান যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ-এর উদ্ভাবনও ঘটে এ বছর। এই যন্ত্রে গাছের বৃদ্ধি লিপিবদ্ধ হয়। কি হারে গাছের বৃদ্ধি হয় সাদা চোখে তা ধরা যায় না। এই ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রে সহজেই তা ধরা পড়ে। এ যন্ত্রের দেশী নাম দিয়েছিলেন 'বৃদ্ধিমান'।

তিনি তাঁর উদ্ভাবিত সব যন্ত্রের নামকরণ করতেন সংস্কৃত শব্দে। কিন্তু পরে তা পালটাতে হয়। এ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তিনি নিজেই—"ইচ্ছা ছিল কলের নাম ক্রেস্কোগ্রাফ না রাখিয়া 'বৃদ্ধিমান' রাখি। কিন্তু হইয়া উঠিল না। আমি প্রথম প্রথম আমার নূতন কলগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলাম, যেমন 'শোষণমান'। স্বদেশী প্রচার করিতে যাইয়া অতিশয় বিপন্ন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই সব নাম কিম্ভূতকিমাকার হইয়াছে বলিয়া বিলাতি কাগজ উপহাস করিলেন। কেবল বোস্টনের প্রধান পত্রিকা অনেকদিন আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্পাদক লেখেন, 'যে আবিষ্কার করে, তাহারই নামকরণের প্রথম অধিকার। তাহার পর নূতন কলের নাম পুরাতন ভাষা লাটিন ও গ্রীক হইতেই হইয়া থাকে। তাহা যদি হয় তবে অতি পুরাতন অথচ জীবন্ত সংস্কৃত হইতে কেন হইবে না?' বলপূর্বক যেন নাম চালাইলাম, কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। গতবার আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সময় তথাকার বিখ্যাত অধ্যাপক আমার কল 'কাঞ্চনম্যান' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, শেষে বুঝিলাম 'কুঞ্চনমান' 'কাঞ্চনম্যানে' রূপান্তরিত হইয়াছে।···

···হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাংলা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের 'বৃদ্ধিমান' নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধিমান—হইতে বার্‌ডোয়ান হইত। তার চেয়ে বরং ক্রেস্কোগ্রাফই ভালো।"

বসু বিজ্ঞান-মন্দির

বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। প্রথমবার বিলাতে গিয়ে যেসব সুন্দর সুসজ্জিত গবেষণাগার দেখেন, নিজের দেশেও তেমনি একটি গবেষণাগার স্থাপনের স্বপ্ন তখন থেকেই শুরু। এতদিন সে স্বপ্ন সার্থক করে তোলা সম্ভব হয় নি। এবার তা বাস্তবে রূপায়িত হবার পথে। কিন্তু তাঁর সুপরিকল্পিত এ-বিরাট কর্মযজ্ঞে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাঁর নিজের যথাসর্বস্ব নিয়ে এগোলেন। দেশের ধনী-নির্ধন সকলেও এগিয়ে এল। বিদেশের গুণী-ধনীজনদের হাতও এগিয়ে এল এ যজ্ঞ সমাধান করতে। দেশের সরকারের অর্থসাহায্যও এল কিছুটা।
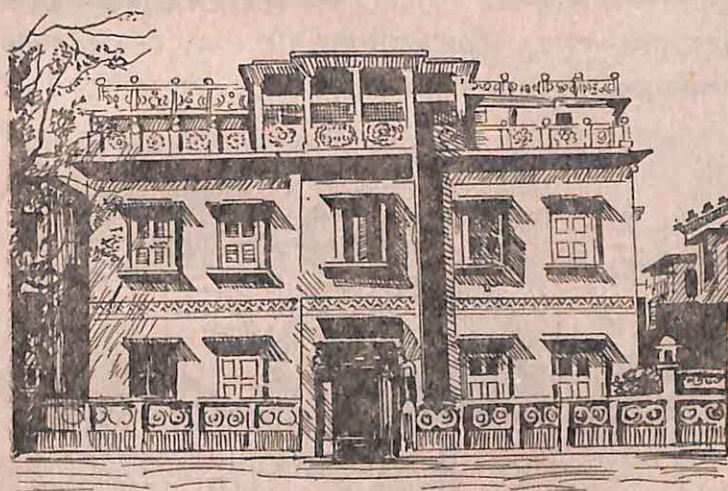
বসু বিজ্ঞান-মন্দির

অধ্যাপক ভাইনস্‌কে একটি চিঠিতে (১৫ নভেম্বর, ১৯১৬) জগদীশচন্দ্র লেখেন, "…বর্তমান দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে বৃহৎ কর্মসাধনে ব্রতী হতে হবে। একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের একটা সৌন্দর্য ছিল। আমি আশা করি, সেদিন আবার ফিরে আসবে। যেখানে বিজ্ঞানের নামে এক সঙ্কল্প সাধনের জন্যে বহু সংখ্যক কর্মীর সহযোগ ঘটবে, এমন একটি মিলন-প্রাঙ্গণ গড়ে তোলবার মধ্য দিয়েই সে বিশ্বজনীন প্রীতি-বন্ধন সম্ভব হবে।"

বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছে জগদীশচন্দ্রর এ চিঠিতে।

কলকাতায় বিজ্ঞান-মন্দির, ফলতায় উদ্ভিদ-জগৎ নিয়ে ফলিত গবেষণার উন্মুক্ত কেন্দ্র আর দার্জিলিংয়ে পাহাড়-চূড়ায় উদ্ভিদ-বিষয়ক পরীক্ষাকেন্দ্র—এই হল মূল পরিকল্পনা। একযোগে এই তিন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হলেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ নভেম্বর তাঁর জন্মদিনে প্রতিষ্ঠিত হল বসু বিজ্ঞান-মন্দির। এ মন্দিরের স্থাপত্য ভারতীয় শিল্পচেতনার ঐতিহ্যে মণ্ডিত। মন্দিরের বহিরঙ্গন এবং অভ্যন্তর ভাগের পরিকল্পনা সুবিন্যস্ত, সুশৃংখল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। আচার্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও দেশজ শিল্পে তাঁর অনুরাগ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে বিজ্ঞান-মন্দির গৃহের সাজে-সজ্জায়। বিজ্ঞান-মন্দিরের বাইরে এবং ভেতরে বিজ্ঞান সাধনার একটি সুন্দর স্বাভাবিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার দিকেই দৃষ্টি

সকলেই জগদীশচন্দ্রকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করেন

ছিল তাঁর। তাঁর ব্রত উদ্‌যাপিত হল। দেশ-বিদেশে স্বীকৃত হল যে, একমাত্র ভারতের ইতিহাসেই নয়, বিজ্ঞান-জগতের ইতিহাসেও বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। পরে ফলতায় এবং দার্জিলিং-এও তাঁর পরিকল্পিত পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমেরিকায়। তিনি লিখলেন, "তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা'হলে আমার খুব আনন্দ হ'ত।"

বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং তখনকার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের অনেকেই। তাঁরাও জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করেন নানাভাবে। তাঁরা সকলেই জগদীশচন্দ্রকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করেন।

কিছুদিনের মধ্যে বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখপত্র 'ট্রানজেকশন' প্রকাশিত হতে থাকে। এতে বিজ্ঞান-মন্দিরের বিজ্ঞান-সাধনার বিচিত্রমুখী প্রয়াসের কথা প্রকাশিত হয়। আবিষ্কার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় অভিজ্ঞতার কথাও এতে প্রকাশিত হতে থাকে। খুব কম সময়ের মধ্যে এই পত্রিকা পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে আগ্রহের সঞ্চার করে এবং সুনাম অর্জন করে।

বিশ্বজনের বিজ্ঞানী

পঞ্চমবার ইংল্যাণ্ডে এলেন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। মনে হল, সমগ্র ইংল্যাণ্ড তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর আবিষ্কারে মুগ্ধ-বিস্মিত বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী-গুণিগণ কেবল তাঁকে অভিনন্দনই জানালেন না, তাঁর বর্তমান গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কেও সব বুঝতে চাইলেন। রয়্যাল ইনস্টিটিউশন, লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে তাঁকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করা হয়। সকল স্থানেই তাঁর সমাদর, মুগ্ধ শ্রোতার ভিড়।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। তখনকার দিনে যে-কোনও দেশের একজন বিজ্ঞানীর এ এক সম্মান-জনক স্বীকৃতি। বিশেষ করে পরাধীন দেশের একজন বিজ্ঞানী, যাঁকে ইতিপূর্বে বহুবার এই সোসাইটির জীব-বিজ্ঞানী সদস্যদের অনেকে স্বীকৃতি দিতে চান নি, সেই বিজ্ঞানীর বেলায় এ সম্মান খুবই অর্থবহ। এ সময় লীড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়েও এক বক্তৃতা দেন। স্যার মাইকেল স্যাড্‌লার সে বক্তৃতা শুনে অভিভূত হন।

বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছেন জগদীশচন্দ্র। অষ্টপ্রহর বিজ্ঞান-তপস্যা। ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা করেছিলেন দেশে

থাকতে। তা থেকে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন রয়্যাল সোসাইটিকে। সেসব তথ্য মহামূল্যবান। সোসাইটি সযত্নে সেসব প্রকাশের ব্যবস্থা করে।

ইউরোপের সব জায়গা থেকে ডাক আসছিল। অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়, প্যারিস শারীরবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে শুরু করে কোথাও বোধ হয় বাকি ছিল না যেখানে তাঁর বক্তৃতা শোনার ডাক পড়ে নি। শুধু ডাক নয়,—অভিনন্দন, স্বীকৃতি আর সম্মাননা। এই পঞ্চমবারের সফরেও ডঃ ওয়ালার তাঁর বিরোধিতায় সক্রিয় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে, তাঁর ধারণা যে ভুল জগদীশচন্দ্র তা প্রমাণ করেন। এ সময়ে জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও গবেষণা সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ 'Life & Works of Sir Jagadishchandra Bose' প্রকাশ করে লংম্যান কোম্পানি। এ গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস্।

জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের অনেকেও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিরূপ ছিলেন। বার্লিনে পরীক্ষা প্রদর্শনের পরে তাঁদের সব সন্দেহ দূর হয়। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য তাঁরা মেনে নিতে বাধ্য হন। কেননা, অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চোখের সামনে সে সত্য প্রমাণ করে।

এই ভ্রমণের সময়ে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভারত-সচিব মন্টেগুর সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তা হয় জগদীশচন্দ্রের। মন্টেগু তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। পরে তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারত সরকার থেকে বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। এ সভাতে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোন্যাল্ড এবং জর্জ বার্নার্ড শ-ও উপস্থিত ছিলেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরলেন। ২৫-এ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে দেশের মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল এক জনসভায়।

শান্তিনিকেতন থেকে ডাক দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ইচ্ছা জগদীশচন্দ্র বিশ্বভারতীর ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেন। জগদীশচন্দ্র সানন্দে সে পদ গ্রহণে সম্মতি দেন।

এর মধ্যেই তাঁর আরও তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সবই তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কারের ও পরীক্ষার অভাবিত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানীরা এসব গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর সম্পর্কে নতুন করে আবার আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাই জগদীশচন্দ্রকে আবার বৈজ্ঞানিক মিশন নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়। এটা তাঁর ষষ্ঠ মিশন। এ মিশন আগের চেয়ে অনেক বেশী চমকপ্রদ। পাশ্চাত্ত্যের জীববিজ্ঞানের সমস্ত ধ্যানধারণা তচ্‌নচ্‌ করে জগদীশচন্দ্র যে সত্যে উপনীত হয়েছেন তাকে অস্বীকার করা বা সন্দেহ করার আর কোন অবকাশ নেই। এবারের সফরে তিনি কেবল একজন আবিষ্কারক নন, সত্যে উপনীত ঋষি, আচার্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন দেশের যশস্বী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, জ্ঞানী ও গুণীদের নিয়ে একটি সংস্থা গঠিত করে লীগ অব নেশন্‌স্‌ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। এই সংস্থার নাম ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটি। এর কর্তৃপক্ষ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্রকে এই সংস্থার একজন সদস্য মনোনীত করে সম্মান দেয়। এ সময়ে প্যারিসের নানা স্থানে তাঁকে তাঁর নতুন আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দিতে হয়। মার্চ মাসে লীগ অব নেশন্‌স্‌ ব্রুসেল্‌স্‌-এর বিজ্ঞান কংগ্রেস তাঁকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া সম্ভব হল না সময়াভাবে। এপ্রিল মাসে ষষ্ঠ সফর শেষ করে দেশে ফিরে আসেন।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে ভাষণ দেন ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ ডিসেম্বর। সেখানে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ইতিপূর্বে একবার এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি বিদেশে। তাই সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। এখানে তিনি তাঁর ভাষণের এক অংশে বলেন, "অতীতে বহু জাতির উত্থান হয়েছে, যারা নিজের শৌর্যে বিশ্বসাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করেছে। তাদের পার্থিব শক্তির খণ্ড কাহিনী মাত্র ইতিহাসের পাতায় ক্ষীণস্মৃতি স্বরূপ বেঁচে আছে। কিন্তু বস্তুজগতের মধ্যে আরও অনেক কিছুর প্রোজ্জ্বল প্রকাশ হয়, যা সবকিছু বিনাশের ঊর্ধ্বে কালজয়ী হয়ে থাকে। সে হলো

মানুষের চিন্তাধারা—পার্থিব সম্পদ নয়, সুকৃতি এবং ভাব ও আদর্শের উদার উজ্জীবনের মধ্যেই মানবতার মহত্তম প্রতিষ্ঠা।”

পরের বছর ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ ডিসেম্বর ভাষণ দেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে। এ সবের মাঝেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্যে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি সে প্রস্তাবে রাজি হন নি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এ কর্মভার তাঁর বিজ্ঞান-সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর নতুন গবেষণা-গ্রন্থ 'The Nervous Mechanism in Plants' লংম্যান কোম্পানি প্রকাশ করে। এ গ্রন্থ তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। এ গ্রন্থের মূল বিষয় হল, প্রাণিদেহের মতো উদ্ভিদ-দেহেও রস-সংবহনতন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্রের সন্ধান এবং পরীক্ষার সাহায্যে তার লক্ষণ সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য করা।

১৯২৬ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর একবার করে ইউরোপে যেতে হয়েছিল জগদীশচন্দ্রকে। ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটির সদস্য হিসেবে প্রতি বছর এই সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে তাঁকে যোগ দিতে হয়েছে। প্রতিবারই সেখানে তাঁর নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা-আবিষ্কার সম্পর্কে জানবার আগ্রহ দেখা গেছে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিবারই আয়োজন করেছে তাঁর বক্তৃতা-সভার। সে সময়কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা, জ্ঞানী-গুণীদের সঙ্গে পরিচয়-পরামর্শ হয়েছে প্রতিবার। আচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, ব্যক্তিত্ব এবং সত্যানুসন্ধানের বৈশিষ্ট্য তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সে দেশে। তার প্রমাণ বেলজিয়ামে রাজকীয় সম্মান লাভ, জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দন। এখানে তাঁর বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং লোরেনৎস্। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে যখন ইউরোপ যান তখন সাহিত্যিক রঁম্যা রল্যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু। এ সময়ে ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা জগদীশচন্দ্রকে নিউটন ও গ্যালিলিওর সঙ্গে তুলনা করে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে

বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক মোলিশ তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। মিউনিক, মিশর প্রভৃতি স্থানেও তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকা থেকে আহ্বান আসে। ফিনল্যাণ্ড বিজ্ঞান সমিতি তাঁকে সদস্যপদ দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা। সে সময়ে মাদাম কুরি, সাহিত্যের অধ্যাপক গিলবার্ট মারে প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিগণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মূল সভাপতি হন আচার্য জগদীশচন্দ্র। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সে অধিবেশন সেরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানেও বক্তৃতা দেন। মাদ্রাজ এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ও আমন্ত্রণ জানায়। এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ভেষজশাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর সে বক্তৃতায় প্রকাশ পায় স্বদেশের বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা। তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—বাঙ্গালীর আর এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। দুই দিক্‌পাল—একজন বিজ্ঞান-ঋষি, আর একজন ঋষিকল্প দার্শনিক। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথম পরিচয়েই অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন দুজনে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের ছাত্রসমাজ এক সম্বর্ধনা দেয় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে। তারপরে আহ্বান আসে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে সমাবর্তন উৎসবে তাঁকে ডি. এসসি. সম্মানে ভূষিত করা হয় (১৭ নভেম্বর, ১৯২৮)।

বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে মাঝে মাঝে সেখানে জগদীশচন্দ্র তাঁর নিজের আবিষ্কার নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতা শোনার জন্যে তখন সারা শহরের লোক ভেঙ্গে পড়ত। বাইরে থেকেও তাঁর বক্তৃতা শুনতে আসত অনেকে। এসব বক্তৃতা শোনার জন্যে প্রবেশ-মূল্য দিতে হত। বক্তৃতার নির্ধারিত তারিখের অনেক আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে যেত। দীর্ঘ লাইন পড়ত টিকিট সংগ্রহের জন্য। এভাবে যে অর্থ সংগ্রহ হত তা সবই খরচ হত বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের উন্নতির জন্যে।

বোম্বাই শহরে একবার তাঁর এক দিনের বক্তৃতা শোনার জন্যে

পঞ্চাশ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। এসব থেকে এই ধারণা হয় যে, তাঁর বিজ্ঞান-বিষয়ে পরীক্ষা-সহ বক্তৃতা সাধারণ মানুষের কাছে সিনেমা-থিয়েটারের চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তার একমাত্র কারণ জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব কথনভঙ্গি এবং আশ্চর্য পরীক্ষা-প্রদর্শন।
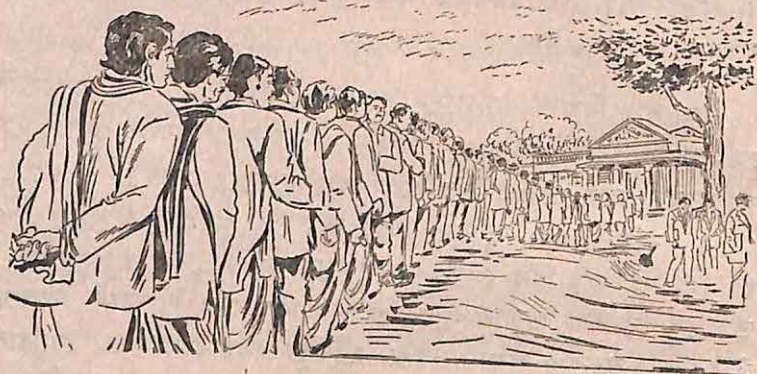
দীর্ঘ লাইন পড়ত টিকিট সংগ্রহের জন্য

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর। সত্তর বছর বয়স হয়েছে জগদীশ-চন্দ্রের। সে উপলক্ষে বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁর জন্ম-জয়ন্তী উৎসব। দেশের মানুষ জানায় তাঁদের অন্তরের অভিনন্দন। অভিনন্দন আসে দেশ-বিদেশের মনীষীদের কাছ থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। নানা দেশের পত্র-পত্রিকায় ঐ দিনটিতে প্রকাশিত হয় তাঁকে নিয়ে নানা সংবাদ, নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ। বার্নার্ড শ, র‍ঁম্যা রল্যাঁও বিজ্ঞানীর প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন তখন। তিনি আসতে পারেন নি জয়ন্তী-উৎসবে। তিনি একটি কবিতায় তাঁর অন্তরের গভীর বাণী প্রকাশ করেন জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে। উৎসবে সে কবিতা পাঠ করেন ইতিহাসবিদ ডক্টর কালিদাস নাগ।

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেয় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল। তখন রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তি-উৎসবের আয়োজন চলছে। জগদীশচন্দ্র ছিলেন এ উৎসবের আহ্বায়ক এবং সভাপতি। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়

Golden Book of Tagore। কিন্তু এ উৎসবে তিনি নিজে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তিনি সে সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিনের জন্যে তখন গিরিডিতে থাকতে হয়েছিল তাঁকে।

আমাদের দেশে শ্রীসয়াজীরাও গায়কোয়ার প্রাইজ এ্যাণ্ড অ্যান্নুইটি নামে তখন একটি বৃত্তি ছিল। এ বৃত্তি প্রতি বছর দেওয়া হত সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পে বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের। এ বৃত্তির আর্থিক মূল্য ছিল এককালীন এক হাজার টাকা এবং প্রতি বছর বারো'শ টাকা। জগদীশচন্দ্রকে এ বৃত্তি দেওয়া হয়

সত্তর বছর বয়স-উত্তীর্ণ জগদীশচন্দ্র

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮-এ মার্চ। সে উপলক্ষে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বরোদায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র। ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগের পঞ্চাশ

বছর পূর্ণ হয়। সে উপলক্ষে এই কলেজে তাঁকে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন হয়। এই সংবর্ধনার সভাপতি ছিলেন বাংলার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক।

অমৃতলোকের যাত্রী

শরীর ভেঙ্গে আসছে। কেবল বয়সের ভারে নয়, বয়সোচিত অসুস্থতা তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর সারা জীবনের মূর্তস্বপ্ন বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজ অব্যাহত রাখার দুশ্চিন্তা। ১৯৩২-৩৩ হিসাব বছরে বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য সরকারী অর্থসাহায্য হ্রাস করা হয়েছিল। তা পরিপূরণের অক্লান্ত চেষ্টা এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পক্ষে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান-মন্দিরের বিপুল কর্মোদ্যোগ পরিচালনায় যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। দেশের সরকার সে বিষয়ে তত মনোযোগী নয় বলে অর্থসাহায্য বাড়ানোর পরিবর্তে হ্রাস করে। কোন বাধা কোন বিরোধ কখনও তাঁর সঙ্কল্প টলাতে পারে নি। হাজারো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনে থেকেছেন অবিচল। কিন্তু বয়সের ভারে যখন তিনি দুর্বল, তখন বিজ্ঞান-মন্দির পরিচালনার নানা রকম অসুবিধার সামনে পড়ে দুশ্চিন্তায় বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুদিন দার্জিলিং-এ বাস করে চলে আসেন গিরিডিতে। সঙ্গে আছেন সহধর্মিণী অবলা বসু।

গিরিডি, ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর। আচার্য খুবই অসুস্থ। সে অবস্থায়ও বিজ্ঞান-মন্দিরের মুখপত্র 'ট্রানজেকশন'-এর কাজ সারছেন নীরবে। আর কিছুদিন বাদে বিজ্ঞান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। কি করবেন না-করবেন তা নিয়েও ভেবে চলেছেন অসুস্থ শরীরে।

২৩-এ নভেম্বর সকাল আটটা। বিজ্ঞান-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আচার্য-পত্নীর আলোচনা হচ্ছে মন্দির-প্রতিষ্ঠা দিবস উৎযাপন এবং আচার্যের আশি বছর বয়স পূর্তি উৎসব কিভাবে হবে তা নিয়ে। একই দিনে উভয় অনুষ্ঠান। কথাবার্তা চলছে। তাঁরা লক্ষ্য করেন নি, আচার্যদেব তখন স্নানাগারে। স্নান করতে গিয়ে স্নানাগারের মধ্যেই আকস্মিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিজ্ঞানী, আচার্য, ঋষি জগদীশচন্দ্র।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। মরদেহ নিয়ে আসা হয় কলকাতায়। অসংখ্য মানুষের নীরব শোকযাত্রা মহানগরের রাজপথ পরিক্রমা করে থেমে যায়—সমাধা হয় শেষকৃত্য।
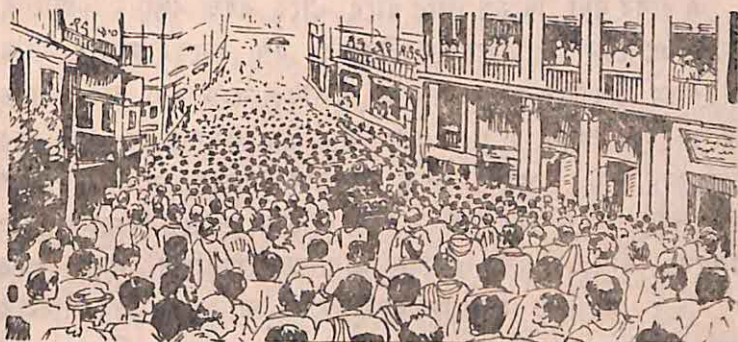
অসংখ্য মানুষের নীরব শোকযাত্রা

আবিষ্কার ও উদ্ভাবন

আজকাল স্কুল-কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের রেওয়াজ আছে। জগদীশচন্দ্র কি আবিষ্কার করেন? —এমন একটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর কি হবে এবং তা কোন্ বিষয়ের প্রশ্নপত্রে থাকতে পারে ভাবতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। তাঁর আবিষ্কার অনেক, এবং তাঁর বিষয় বিজ্ঞানের বিশেষ কোনও শাখায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বলা যায়, তাঁর বিষয় বিজ্ঞান এবং তাঁর গবেষণা ছিল বিশ্ব-রহস্যের দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে। তাঁর আবিষ্কারকে বিষয়ানুগ বলার চেয়ে রহস্যানুগ বললে বোধ হয় ঠিক বলা হবে। তাই, জগদীশচন্দ্র কি আবিষ্কার করেন, এ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যায় না।

পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতে করতে সে বিষয়ে ছাত্রদের বোঝাতে গিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাতে-কলমে দেখাতে হয়েছে তাঁকে। তা ছাড়া, ছাত্র বয়স থেকেই ফটোগ্রাফির ব্যাপারে খুব কৌতূহলী ছিলেন। ফটোগ্রাফি পদার্থবিজ্ঞানে আলো-সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দিকে অধ্যাপনা

করতে গিয়ে এ বিষয়ে তাঁর নানা চিন্তা-ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারই ফলে নিজের বাড়িতে ছোট একটি স্টুডিও পর্যন্ত গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে রীতিমত গবেষণা করতেন ফটোগ্রাফি নিয়ে।

এ সবের মধ্য দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে রহস্য-সন্ধানী বিজ্ঞানের পথে এসেছেন। অধ্যাপনা-জীবনের দশ বছরের মাথায় তাঁর ছত্রিশতম জন্মদিনে মনে হল নতুন কোনও কর্মসাধনা চাই, যাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। এবং তাঁর সে কর্মসাধনার পথ হবে বিজ্ঞানের পথ। কারণ, তখন আধুনিক বিজ্ঞানে সারা পৃথিবীতে ভারতের কোনও স্থান নেই। কিন্তু প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা মানুষের কর্মপ্রেরণাকে একদিন প্রসারিত করেছিল, মানুষ লাভ করেছিল মহাবিশ্ব সম্পর্কে মহাজ্ঞান। ভারতের সেই সাধনার কথা আধুনিক জগৎ ভুলে গেছে। একজন ভারতীয় হিসেবে তাই তাঁর মনে হয়েছিল, বিজ্ঞানে ভারতকে আবার উন্নত করতে হবে।

অদৃশ্য-আলোক সম্পর্কিত গবেষণা

বিজ্ঞানী জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, কোন স্থানে তড়িৎ ক্ষেত্রের বা চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটতে থাকলে ঐ স্থানে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ম্যাক্সওয়েল আরো দেখান যে, এই তরঙ্গ শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে আলোর গতিতে চারদিকে সঞ্চালিত হয়। ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব থেকে এও বোঝা যায় যে, তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। কাজেই, অদৃশ্য তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকে 'অদৃশ্য আলো' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ম্যাক্সওয়েল তাঁর গাণিতিক তত্ত্বে এই অদৃশ্য আলোর অস্তিত্বের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন মাত্র, এরূপ তরঙ্গ যে সত্যিই আছে তা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখান নি। ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করেন জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিশ হার্ৎস। লর্ড র‍্যালের আগে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে তাঁর গবেষণার নানান নিদর্শন সযত্নে-রক্ষিত হয়। কেম্ব্রিজের তরুণ ছাত্র জগদীশচন্দ্র এসব

দেখে ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিজ্ঞানী অলিভার লজ-এর একটি বই পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং শ্রীমতী অবলা বসুর প্রেরণায় অদৃশ্য আলো এবং দৃশ্য আলোর সমধর্মিতা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হলে তা সহজে গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে না। হার্ৎস সবচেয়ে ছোট যে-তরঙ্গ উৎপন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার দৈর্ঘ্য ছিল ৬৬০ মিলিমিটার। জগদীশচন্দ্র আরো ছোট তরঙ্গ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে গবেষণা শুরু করেন। কিছুদিনের চেষ্টায় তিনি একটি মাইক্রোওয়েভ যন্ত্র তৈরী করেন এবং সাফল্যের সঙ্গে এক ইঞ্চির ছ'ভাগের এক ভাগ দৈর্ঘ্যের অদৃশ্য আলোক তরঙ্গ তৈরী করতেও সক্ষম হন। এ ছাড়া, অদৃশ্য আলোর গ্রাহক যন্ত্র 'কোহেরার'-এরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেন। এর ফলে অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ধরা এবং প্রেরণ করা সহজ হল। তিনি এসব পরীক্ষার জন্যে যে গ্যালভানোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করতেন তাকে অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ ধরার জন্যে আরও উন্নত ও সক্রিয় করে গড়ে তোলেন।

সাধারণ দৃশ্য-আলোকে আলোকিত বস্তু আমরা সাদা চোখে অনায়াসে দেখতে পাই। কিন্তু অদৃশ্য আলোকের প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং সমবর্তনের ক্রিয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। তাই গ্যালভানোমিটার যন্ত্রে এই অদৃশ্য আলোর ক্রিয়াকলাপ স্পষ্ট করে দেখার জন্যে তাঁর এই নতুন উদ্ভাবনা। এই যন্ত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, দৃশ্য আলো যেমন সরলরেখা বরাবর চলে, অদৃশ্য আলোও তাই।

এসব নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জগদীশচন্দ্র অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪ মিলিমিটারে নামিয়ে প্রায় দৃশ্য আলোক-তরঙ্গের সমপর্যায়ে নিয়ে এলেন। এটি এক বিস্ময়কর সাফল্য। এ সাফল্যের জন্যে বিজ্ঞান-জগতে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি এর জন্যে তাঁকে একটি বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করে এবং তাঁর গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশেরও দায়িত্ব নেয়। এ সম্পর্কে তখনকার ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এম. করনু

তাঁকে লিখেছিলেন, 'আপনার যন্ত্রপাতিকে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত করে আপনি যেভাবে পূর্ণতা এনেছেন তার তুলনা নেই।'

বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ

অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করতে করতে একদিন আবিষ্কার করলেন বিনা তারে সঙ্কেত প্রেরণের প্রক্রিয়া। তাঁর এ আবিষ্কারে বিজ্ঞান-জগৎ এবং সারা বিশ্বের মানুষ বিস্ময়ে অবাক হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম তিনি এ আবিষ্কার পরীক্ষা করেন। এ পরীক্ষায় এক ঘর থেকে অন্য একটি ঘরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে একটি পিস্তল ছোঁড়া হয়েছিল। ঘরের পুরো দেয়াল ভেদ করে অদৃশ্য বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে এমন একটি ঘটনা ঘটানোয় সেদিন কারো আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার পরের বছর কলিকাতা টাউন হলে তিনি তাঁর এ পরীক্ষা আরও উন্নত প্রক্রিয়ায় প্রদর্শন করেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'অদৃশ্য আলোক ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করিয়া অনায়াসেই চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাংলার লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর স্যার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ-উর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল।'

জগদীশচন্দ্রের এ আবিষ্কার সেদিন পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা তাঁর এই অভাবিত আবিষ্কারে একবাক্যে তাঁকে বিজ্ঞান-প্রতিভার অবিস্মরণীয় ব্যক্তি বলে স্বীকার করে।

সে যুগে তাঁর এ আবিষ্কার বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। তখন সমুদ্রে চলা কালে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে বা পোতাশ্রয়ে সঙ্কেত বা বার্তা পাঠাবার কোনও সুবিধাজনক সহজ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রে জাহাজ চলাচল নিরাপদ হয়। কারণ, বিপদ-আপদে সহজেই বিনা তারে বার্তা প্রেরণের আর অসুবিধা থাকল না।

জগদীশচন্দ্র পরে লণ্ডনে যখন তাঁর বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার পরীক্ষা দেখান, তখন সেখানকার এক কোটিপতি তাঁর বেতার-সঙ্কেত পাঠাবার যন্ত্রটি জগদীশচন্দ্রের নামে পেটেণ্ট করার অনুমতি চায় এবং প্রস্তাব দেয় যে, ঐ যন্ত্র নির্মাণ ও প্রচারের সব খরচা সে দেবে, মুনাফার অর্ধেক অংশ পাবেন আবিষ্কারক। জগদীশচন্দ্র তাতে রাজি হন নি। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে (১৭-৫-১৯০১) তিনি লিখেছিলেন, 'এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এদেশের টাকার মায়া দেখিতে—টাকা টাকা—কি ভয়ানক সর্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি একবার যাঁতাকলে পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ, আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপর মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিয়াছে, আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম।'

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইতালির ইলেকট্রিক এঞ্জিনিয়ার মার্কনি বেতারে সংবাদ পাঠাবার যন্ত্রের পেটেণ্ট নিজের নামে করেন। জগদীশচন্দ্র সে সম্পর্কে বলেছেন, 'তাঁহার অত্যদ্ভুত অধ্যবসায় ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক উন্নতিসাধনে কৃতিত্বের দ্বারা পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর ব্যবধান একেবারে ঘুচিয়াছে। পূর্বে দূর দেশে কেবল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরিত হইত, এখন বিনা তারে সর্বত্র সংবাদ পৌছিয়া থাকে।'

জড় ও জীবের অদৃশ্য ঐক্য

প্রথম বার বিদেশ থেকে ঘুরে এসে আবার বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর আবিষ্কার বিদেশে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এবার ঐ একই বিষয়ে নবতর আবিষ্কারের সন্ধানে মন দিলেন তিনি। গবেষণাগারে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে নানা পরীক্ষা চালাতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার তাঁর নজরে পড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন, যন্ত্রের কাজ ক্রমাগত চলতে থাকলে এক সময়ে জৈব কোষের ক্লান্তির মত সে যন্ত্রেও একটা ক্লান্তি বা অবসাদের অবস্থা দেখা দেয়। মানুষ কিছুক্ষণ বিশ্রাম

নিলে ক্লান্তি কাটিয়ে উঠতে পারে, ঠিক তেমনি দেখা গেল, কিছুক্ষণ বিরতি দিলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার ক্ষমতা ফিরে পায়।

যন্ত্র জড় পদার্থ। তার এ ধরনের জৈব অবস্থা কি করে হতে পারে? ভেবে অবাক হলেন জগদীশচন্দ্র। তবে কি জড় ও জীবের গঠনে কোনও গোপন সাদৃশ্য বা ঐক্য আছে যা মানুষ জানে না বা দেখতে পায় না! গবেষণা শুরু হল। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে সিদ্ধান্তে এলেন, জড় ও জীবের আণবিক গঠনে একটি ঐক্য আছে। যার জন্যে বাইরের উত্তেজনায় জৈব কোষ যেমন উত্তেজিত হয়, সাড়া দেয় আবার অবসাদগ্রস্ত হয় এবং ক্রমাগত উত্তেজনায় অকেজো হয়ে পড়ে বা কর্মক্ষমতা হারায়, জড় পদার্থেও সেই একই অবস্থা দেখা দেয়। অর্থাৎ এ জগতের যাবতীয় জড় ও জীবের অস্তিত্বে একটি অবিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি তাঁর পরীক্ষায় দেখালেন, উত্তেজনায় জৈব কোষ যে রকম সাড়া দেয়, জড় কোষও প্রায় অনুরূপ সাড়াই দিয়ে থাকে—তাঁর নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে এসবের সাড়ালিপি গ্রহণ করে এ সত্য তিনি সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

যে অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গের সূত্রে আবিষ্কার করেছেন বিনা তারে বার্তা পাঠাবার রহস্য, সেই একই সূত্রে জড় ও জীবের সাড়া-রহস্য উদ্ঘাটন করলেন জগদীশচন্দ্র। অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গ থেকে তাই তাঁকে তখন অনেকটা অন্য পথে সরে আসতে হল। জড় ও জীবের সাড়া বিষয়টি শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কিন্তু জগদীশন্দ্র দেখলেন পদার্থবিজ্ঞান আর শারীরবিজ্ঞান বলে যে আলাদা বিষয় ভাগ করা হয়েছে তা নিতান্তই বাইরের গঠনগত বৈষম্যের ব্যাপার। আসলে এ সবই একটি অবিচ্ছিন্ন মহা রহস্যের ঐক্যে আবদ্ধ। এ সম্পর্কে তিনি দেখেছেন, "জীব ও জড়ের মধ্যে যে প্রাণধর্মের লীলা চলছে, কোথাও তার ছেদ নেই। দুয়ের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করা কঠিন—কোথায় জড়-প্রকৃতির শেষ, কোথায় জীবনধর্মের শুরু।"

জড় ও জীবের সাড়া প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপে যখন প্রথম বক্তৃতা দেন, নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে সকলের চোখের সামনে জড় ও জীবের

সাড়ালিপি উৎকীর্ণ করে দেখিয়ে বলেছিলেন, "···আমি আপনাদের জীব এবং জড়ের পীড়ন ও কর্ষণ-ইতিহাসের স্বহস্তলিখিত তথ্য ও বিবরণ দেখালাম। তাদের তুইয়ের লিপিতে কত মিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের লিপি-পদ্ধতি এতই সাদৃশ্যযুক্ত যে, একের লেখা অপরের লেখা থেকে আলাদা করে নেওয়া যায় না। আমরা লক্ষ্য করেছি, প্রায় অনুরূপ সংবেদনশীল সাড়ার বৃদ্ধি ও হ্রাস। আমরা দেখেছি, জড় ও জীবের সংবেদনশীলতা একই ভাবে শ্রান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে, উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার বিষক্রিয়ায় মারা যায়। ···এই সব তথ্যপ্রমাণ কি বলে না যে বস্তুর কতগুলো গুণ একান্ত সার্বজনীন ও চিরায়ত?"

ধাতুতে বিষক্রিয়া তো দূরের কথা, কোনও জড় বস্তুতে যে সাধারণ সংবেদশীলতা থাকতে পারে, আজও এ কথা বুঝতে আমাদের কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের দ্বারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ধাতুতে বা জড় বস্তুতে সত্যি এক ধরনের সংবেদন-শীলতা বর্তমান এবং বিশেষ বিশেষ ধাতুতে বিশেষ বিশেষ বিষ-প্রয়োগের ফলে তাদের আণবিক গঠন শিথিল ও অকেজো হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বারের সফরে ইউরোপে তাঁর এ আবিষ্কার একদিকে যেমন তুমুল আলোড়ন তুলেছিল, অন্য দিকে তাঁর বিরুদ্ধে এক দল জীববিজ্ঞানীর তীব্র বিরূপ মনোভাবও হয়ে উঠেছিল উত্তাল। জীববিজ্ঞানীদের অনেকেই জড় ও জীবের সাড়া ব্যাপারটা সহজে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা অনেকে এসব ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, বিষয়টি সম্পূর্ণ জীববিজ্ঞান তত্ত্বের, কিন্তু জগদীশচন্দ্র হলেন পদার্থবিজ্ঞানী, তাঁর পক্ষে এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং সিদ্ধান্তে আসা অনধিকার ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের যে সিদ্ধান্ত তাই শেষ পর্যন্ত সকলেই সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাই তাঁর সিদ্ধান্তকে বাতিল করতে তৎপর হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্র সকলকে এ সত্য বোঝাতে সক্ষম হন যে, "প্রকৃতির অজস্র আপাতবৈষম্যের অন্তরালে রয়েছে যে

শাশ্বত এক মৌল ঐক্য", তিনি জড় ও জীবের মধ্যে সে ঐক্যেরই একটি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেছেন মাত্র।

উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া

দ্বিতীয় সফরের সময় ইউরোপে বসেই গবেষণা চলছিল অবিরাম। জড় ও জীবের সাড়া নিয়ে ক্রমাগত পরীক্ষা করতে করতে একদিন মনে হল, জড়, জীব এবং উদ্ভিদ এই তিন আপাতভিন্ন সীমার মধ্যে যদি অন্তর্নিহিত একটি ঐক্য থাকে, উদ্ভিদের প্রাণ-ক্রিয়ার স্বরূপ তবে কি? গবেষণা শুরু হল। লক্ষ্য করে দেখলেন, উদ্ভিদের জীবনে তাদের প্রাণক্রিয়া প্রাণীর অনুরূপ। এমন কি, তাদের ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা না থাকলেও তারা তাদের ভাবপ্রকাশে নিষ্ক্রিয় নয়। জগদীশচন্দ্র বলেছেন, "এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবনধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তার পর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ, গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র।"

বিদেশে থাকতেই এ নিয়ে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। দেশে ফিরে শুরু করলেন গবেষণা। দেশীয় গাছগাছড়ার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেন উদ্ভিদও উত্তেজনায় প্রাণীর মত সাড়া দেয়, বিষক্রিয়ায় মারা যায়—প্রাণীর অনুরূপ যাবতীয় প্রাণক্রিয়া রয়েছে উদ্ভিদেও।

উদ্ভিদ-দেহের কোন স্থানে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঐ উত্তেজনা কিভাবে সঞ্চালিত হয় তা অনুধাবনের জন্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভাবন করেন

'রেজোন্যান্ট-রেকর্ডার' যন্ত্র। উদ্ভিদের উত্তেজনা কী বেগে উদ্ভিদ্-দেহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় এ যন্ত্র দিয়ে তা-ও নির্ধারণ করা যায়। উদ্ভিদের উদ্দীপনা, যন্ত্রণা, বিষাদ, ক্লান্তি, মৃত্যু ইত্যাদি সব অবস্থার কথা এ যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় গ্রাফ-এর আকারে।

লজ্জাবতী লতা ও বনচাঁড়াল গাছের স্বভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সাদা চোখেই ধরা পড়ে। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করলে বা তার গায়ে সামান্য আঘাত লাগলে সে পাতা গুটিয়ে ফেলে, যেন লাজুক মেয়েটি লজ্জায় জড়সড়ো হয়ে আছে সব সময়। আর বন-চাঁড়াল গাছ সারা দিন পাতা মুড়ে রেখে যেন ঝিমুতে থাকে। যেমনি সূর্য অস্ত যায়, সে তার পাতা বিস্তার করে সজাগ সতেজ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, দিনের তাপের প্রভাবে তার পাতা মুড়ে থাকে। তাপ কমে গেলে রাতে তার পাতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তিনি এসব গাছের সঙ্কোচন-প্রসারণ পরীক্ষার জন্যে আবিষ্কার করেন কুঞ্চনমান বা কুঞ্চনগ্রাফ যন্ত্র।

আবহাওয়ার পরিবর্তনে, ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তনে, ঋতুর পরিবর্তনে যেমন মানুষ বা প্রাণীর দেহের সংবেদনশীলতার পরিবর্তন ঘটে, জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রে দেখালেন যে, উদ্ভিদেও সেই একই ব্যাপার ঘটে। উদ্ভিদ-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ রহস্য উন্মোচনে তাঁর অদম্য সাধনা উদ্ভিদ-জগৎ সম্পর্কে মানুষের চিরাচরিত ধারণায় বিপ্লব ঘটাল। তিনি দেখলেন, উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া এবং জীবন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য প্রাণী-জগতে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানী মানুষের প্রাণক্রিয়া এবং জীবন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যের তুলনায় কোনও অংশেই কম নয়।

গাছের স্পন্দনের প্রতিলিপি গ্রহণের জন্যে উদ্ভাবন করেন 'প্ল্যান্ট ফাইটোগ্রাফ' (Plant Phytograph) যন্ত্র। মানুষের হৃদ্স্পন্দন যেমন হয়, তিনি এ যন্ত্রে দেখালেন, উদ্ভিদের স্পন্দনের প্রতিলিপি প্রায় অনুরূপ। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে প্রাণিদেহে যে রকম স্পন্দন দেখা দেয়, উদ্ভিদ-দেহেও সেসব রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া একই রকম। "এই যন্ত্রের সাথেই নিজের কাজের উপযোগী করে তৈরী একটি গ্যালভানোমিটারের সংযোগ ঘটিয়ে প্রমাণ করলেন, সব গাছের ভেতরেই প্রাণীর মত বৈদ্যুতিক সাড়ার অস্তিত্ব রয়েছে।

উদ্ভিদের ব্যাসের বৃদ্ধি, কাণ্ডের স্পন্দন তেরো লক্ষ গুণ বড় করে দেখার জন্য অপ্‌টিক্যাল স্ফিগ্‌মোগ্রাফ (Optical Sphygmograph) যন্ত্র তিনি তৈরী করেন। এ যন্ত্র দিয়ে দেখালেন গাছের স্পন্দনের হার প্রায় পাঁচ সেকেণ্ডে একবার। উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করে হারের হেরফেরও সুন্দরভাবে দেখান। আরও একটি মজার পরীক্ষা তিনি এ যন্ত্র দিয়ে সে যুগে দেখিয়েছিলেন। প্রাণী যে রকম আঘাত-জনিত মৃত্যুর সময় যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, গাছও বিষ-প্রয়োগে বা আঘাতজনিত মৃত্যুর সময় একই দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।"*

ক্রেস্কোগ্রাফ নামে একটি যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। সে যন্ত্রে উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রতিলিপি ধরা পড়ে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণত সহজে ধরা যায় না। গাছ কত সময়ে কত বেড়ে উঠছে তা পরিমাপ করা সহজ নয়। জগদীশচন্দ্রের এ যন্ত্রে গাছের সূক্ষ্ম বৃদ্ধি এক কোটি গুণ বড় করে দেখা যায়।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে উদ্ভিদ-জীবন পর্যন্ত তিনি তাঁর তথ্য প্রমাণের জন্যে যেসব যন্ত্র উদ্ভাবন করেন সেগুলোও বিজ্ঞানী-মহলে আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কারণ, উদ্ভাবন-শৈলীর নিপুণ প্রয়োগে অতি সাধারণ টিনের পাত, দস্তার টুকরা, লোহার নল ইত্যাদি হয়ে উঠেছে তাঁর অসাধারণ যন্ত্রের উপকরণ।

উদ্ভিদ-জীবন-রহস্য নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবন যে কত গভীরের বিষয় ছিল, দু'একটি ঘটনা থেকে তা সহজে বোঝা যায়। একবার রব ওঠে যে, ফরিদপুরের কোন্ এক গ্রামের মন্দিরের চত্বরে সূর্যাস্তের সময় একটি খেজুর গাছ সূর্যকে প্রণাম করে মাটিতে শুয়ে পড়ে। আবার সকাল বেলা সে গাছ সূর্য ওঠার সাথে সাথে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ায়। গ্রামীণ জীবনে এ ঘটনা নানা মুখে নানা ভাবে ছড়িয়ে এক ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। সাধারণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষই সে গাছ দেখে অভিভূত হয়। সকলের ধারণা হয়, এ এক দৈবী ব্যাপার। নয়তো গাছ কখনও এমন করতে পারে!

* 'উদ্ভিদ তাত্ত্বিক গবেষণায় আচার্য জগদীশচন্দ্র', দিবাকর সেন, নানা চোখে ঋষি-বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র।

ব্যস্, আর কথা নেই, সে গাছের গোড়ায় পড়ে যায় পূজা-পার্বণের ধুম।

গল্প ছড়াতে ছড়াতে কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের কানে এসে লাগে। খোঁজ-খবর নিয়ে গাছটিকে দেখার জন্যে তাঁরও আগ্রহ জাগে। একবার গিয়ে দেখেও এলেন সেই খেজুর গাছ। সব দেখে-শুনে একটা সিদ্ধান্তেও এলেন। কিন্তু সঠিক পরীক্ষা না করে সে সিদ্ধান্তই যে সত্য তা বোঝা যাবে কি করে!

পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, গাছটি লম্বায় ৫ মিটার আর তার বেড় ২৫ সেন্টিমিটার। মাটির সঙ্গে ৬০ ডিগ্রী কোণ করে হেলে আছে। কাণ্ডটি কিছুটা বাঁকা। অনুমান করা হল, ঝড় বা অন্য কোনও কারণে গাছটি এভাবে বেঁকে হেলানো অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু যা শোনা গেছিল তা হুবহু ঘটনা নয়। গাছটি কোন সময়ই নিশ্চল হয়ে থাকে না। সব সময়ই নীচু বা উঁচু হচ্ছে। সকাল সাতটায় এ গাছ সবচেয়ে বেশি উঁচু হয়, আর বিকেল সোয়া তিনটের সময় সবচেয়ে বেশি নিচু হয়। তারপরে আবার আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে সকাল সাতটা পর্যন্ত। অর্থাৎ, বিকেল বেলা থেকে সে গাছ উঁচু হতে হতে সকালে সবচেয়ে বেশি উঁচু হয়ে আবার ধীরে ধীরে নিচু হতে থাকে।

অন্যান্য গাছের বেলাতেও এ ঘটনা ঘটে কিনা তার খবরাখবর নিতে গিয়ে হাওড়ার সিজবেড়িয়াতেও একটি ঐ রকম খেজুর গাছের সন্ধান পেলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু এখানে প্রায় মানুষের চোখের আড়ালেই রয়েছে সে গাছ। বুঝলেন, পরিবেশের কোনও নিয়মিত পরিবর্তনের ফলেই এ ঘটনা ঘটছে। পরীক্ষায় দেখা গেল, পরিপার্শ্বের উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধির জন্যেই এ রকম হয়ে থাকে। "ক্রমবর্ধমান তাপের সঙ্গে সমতা রেখে গাছটি নিচু হতে থাকে ও তাপ যত কমতে থাকে গাছটির মাথাও আস্তে আস্তে উঁচু হতে থাকে। তিনি বললেন, গাছের এই উত্থান-পতন বা চলন গাছটির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর তাপের প্রভাবের ফল। গাছের মূল মাটির নিচে চলে (Positively geotropic)। কাণ্ড আকাশের দিকে যায় (Negatively geotropic)। গাছটি ছিল বেশ হেলানো। তাই নিয়ম অনুসারে গাছটি তার মাথাকে অর্থাৎ কাণ্ডের অগ্রভাগকে

ক্রমাগত উঁচু করার চেষ্টা করবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিবেশের তাপ-বৃদ্ধি গাছের কাণ্ডের মাথা উঁচু করার প্রবণতাকে বাধা দিচ্ছে। ফলে গাছের মাথা নিচু হচ্ছে।"*

আর একবার রব উঠল, একটি আম গাছ নাকি কাঁদে। সারা দিন তার গা বেয়ে চোখের জল পড়ে। জগদীশচন্দ্র এ গাছ দেখেও জল পড়ার ব্যাখ্যা দিলেন। একটি আমগাছের ডাল থেকে দিনের বেলা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে, রাত্রে নয়, এই হল ব্যাপার। পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র বললেন, কোন কারণে ডালটির ভেতরে কোথাও পচে গিয়েছে। সেই পচা জায়গায় গাছের রস জমে গিয়ে বাকলের কোনও ছিদ্র দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে। এই রস দিনের বেলাই পড়ে, কারণ দিনের উত্তাপে গাছের সজীব কোষের সক্রিয়তা বাড়ে এবং তার পার্শ্বচাপে গাছের পচা জায়গায় রস জমে বেশি করে। আর তারই জন্যে সে রস উপচে বাইরে বেরিয়ে আসে। দিনের শেষে যখন উত্তাপ কমে আসে তখন গাছের সজীব কোষের উত্তেজনাও কমে আসে। তাই ধীরে ধীরে রস জমা কমতে থাকে, রাতের বেলায় আর সে রস বেরিয়ে আসে না।

"শাপলা রাত্রে ফোটে। দিনে ফোটে না। 'কুমুদিনীর এই নিশিজাগরণের' কারণ সম্পর্কে তখনকার বিজ্ঞানীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। জানা যায় জগদীশচন্দ্রের এক ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, 'উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে, ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়াল মাত্র। কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এরূপই করিয়া থাকে। আর পদ্ম দিনে ফোটে, রাত্রে মুদিয়া যায় ; কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে। একবার প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকে/তর্পণে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥ (তিল আর সরষে উভয়ই তেল দেয়, কিন্তু তর্পণ করতে তিল দরকার, সরষে নয় কেন?) তাহার উত্তর আসিয়াছিল—ঢাকঞ্চ ঢোলকশ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে/গাজনে ঢাক দরকারং

---

* দুটি জনরব ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, দিবাকর সেন, শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

ঢোলং নাস্তি যে কারণে॥ (ঢাক আর ঢোল দুই-ই বাদ্য, কিন্তু ঢোল না বাজিয়ে ঢাক যে জন্যে গাজনে বাজানো হয়ে থাকে।) কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না-ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকম কৈফিয়ৎ মিলিত।'

"এই ফুল ফোটার কারণ অনুসন্ধানের প্রশ্নে প্রথমেই একটি চিন্তা জগদীশচন্দ্রের মনে এসেছিল। শাপলার এই পাপড়ি খোলা ও বন্ধ হওয়া পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটছে কিনা? স্বাভাবিকভাবে ফোটা ফুলের পাপড়িগুলি যদি ওপরের দিকে যায় তবে ফুলটি বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি নীচের দিকে নামে তবে ফুলটি আরও প্রস্ফুটিত হবে। মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় যদি ফুলের ফোটা নির্ভর করে তবে ফুলটির মাথা নীচের দিকে রাখলেই বিপরীত ক্রিয়া দেখা যাবে। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, শাপলাফুল সোজাভাবেই থাক আর উল্টাভাবেই থাক তাতে ফুল ফোটার সময়ের কোন হেরফের হয় না। অন্য একটি পরীক্ষায় দেখলেন আলোর ক্রিয়ার ওপরও ফুল ফোটা নির্ভর করে না। নিজের উদ্ভাবিত 'Diurnal Phytograph' যন্ত্রকে এই পরীক্ষার উপযোগী করে তিনি শাপলা ফুলের পাপড়ির ধারাবাহিক লিপিচিত্র নিলেন, সেই সঙ্গে একই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধারাবাহিক উষ্ণতার পরিবর্তনের লিপিও। উপসংহারে এলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। বললেন, শাপলার ফোটা ও বন্ধ হওয়া একমাত্র তাপের প্রভাবেই হয়। পরীক্ষায় প্রমাণ করে দেখালেন দিনের বেলায় যদি শাপলা ফুলের কুঁড়ির চারিদিকে রাত্রের তাপমাত্রা বজায় রাখা যায় তবে দিনেও শাপলা ফুল ফুটতে পারে।"*

সম্ভাবনার ইঙ্গিত

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের স্তর তিনটি। প্রথম, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি; দ্বিতীয়, জড়ের সাড়া; তৃতীয়, উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়া। এই তিন স্তরে প্রধানত পদার্থবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান,—প্রচলিত ধারণায় যা প্রায় পরস্পর বিরোধী, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের খণ্ড-বিষয় থেকে অখণ্ড অবিভেদ্য সাম্যে উত্তরণের জন্যেই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর আবিষ্কারের ধারার মূল উৎস

---

* দুটি জনরব ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, দিবাকর সেন, শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

প্রাকৃতিক রহস্য, প্রধান প্রেরণা বিজ্ঞানে স্বদেশের প্রতিষ্ঠা। তাঁর কয়েকটি আবিষ্কার ব্যবসায়িক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ উপায়ের অনুকূলে ছিল। কিন্তু তাঁর সে দিকে নজর ছিল না। তিনি আবিষ্কারের পর আবিষ্কার করে গেছেন, তাঁর তথ্য নিরূপণের জন্যে যন্ত্র নির্মাণ করেছেন একের পর এক—বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এর যে-কোনও একটির জন্যেই একজন বিজ্ঞানী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন।

গাছের সালোক-সংশ্লেষ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র যেসব তথ্য দিয়েছেন তা থেকে পরবর্তী কালে উদ্ভিদবিদ্যার বহু জটিল রহস্য উন্মোচনের ইঙ্গিত পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। গাছের এবং প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র যেসব মৌলিক সাদৃশ্য এবং রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, বর্তমান কালের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সে সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ অভিমত দিয়েছেন। তাঁদের মতে, আজকের কমপিউটার বিজ্ঞানের মূল সূত্রের জনক হলেন জগদীশচন্দ্র। কারণ, তিনিই উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের সাদৃশ্যের কথা বলে আমাদের সচেতন করেছিলেন এক অদৃশ্য আণবিক ক্রিয়া সম্পর্কে। আজকের কমপিউটার যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতিতে দেখা যায় স্নায়ুতন্ত্রের অনুরূপ যান্ত্রিক সংযোগ। কমপিউটার যন্ত্রেও কৃত্রিম মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে একটি প্রাণী-দেহের তান্ত্রিক সঞ্চালন-ক্রিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের যন্ত্রীকরণ হয়েছে। জগদীশচন্দ্র যদি উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাণক্রিয়ার তুলনামূলক পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে না আসতেন যে, এই উভয়ক্ষেত্রে প্রাণের কলা-কৌশল একই, তা হলে হয়তো কমপিউটার-এর মতো জটিল যন্ত্র-কর্মী নির্মাণ ও সক্রিয় করতে আরো দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালাতে হতো।

আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নির্মোহ মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে জগদীশচন্দ্র জড়, জীব ও উদ্ভিদের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তা থেকে যে মৌলিক সত্যে উপনীত হয়েছেন তা হল, এ সৃষ্টিপ্রকল্পের সবকিছুতে বাইরের দিক থেকে যতই অমিল দেখা যাক না কেন, ভেতরের প্রেরণার মূলে আছে একই মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই নানাভাবে, নানারূপে, বিবিধ পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজ্ঞান-মানস

উচ্চতর গবেষণা-কাজের ক্রমপর্যায়ে জগদীশচন্দ্র অনুভব করেছিলেন বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে শুধুমাত্র সুসজ্জিত সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনের যন্ত্রসম্ভার থাকলেই চলে না। বিজ্ঞান-চেতনা জাগানোর জন্যে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলেরও দরকার। ইউরোপের বিভিন্ন গবেষণাগার দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, আধুনিক বিজ্ঞান-বিষয়ে আমাদের দেশের অজ্ঞানতা এবং অনাগ্রহের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব। বিদেশের গবেষণাগারগুলোতে দিনের পর দিন যখন চলছিল নব নব আবিষ্কারের সাধনা, তখন আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা ছাত্রদের শেখাতেন সেসব আবিষ্কারের অনুকরণমাত্র। ফলে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভাবনী মনোভাব গড়ে উঠত না, বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান-প্রয়োগের প্রয়োজন সম্পর্কেও তারা সজাগ হত না।

নিজের গবেষণা-কাজের জন্যে তাই তাঁকে নানা অসুবিধার মধ্যেও একটি বিশেষ পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছিল, উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নানা ধরনের যন্ত্র—যা খুব সহজ কাজ ছিল না। তাতে বাধা এসেছে, অসহযোগিতা এসেছে, আর্থিক অসাচ্ছল্যের দুর্ভোগ এসেছে। তিনি ধীর পদক্ষেপে এগিয়েছেন। একের পর এক সেসব অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি স্বপ্নও ধীরে ধীরে বাস্তবের পথে এগিয়ে আসছিল। বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিকল্পনা একদিনে রূপ পায় নি। তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কর্মপ্রেরণা এবং দেশাত্মবোধ একত্র হয়ে সে বিজ্ঞান-কর্মের যজ্ঞশালা গড়ে উঠেছিল প্রধানত তাঁরই একার উদ্যোগে এবং ত্যাগে। বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার পটভূমিকে তাই বলা যেতে পারে তাঁর বিজ্ঞান-মানস। বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁর অভিভাষণ শুরু করেছিলেন এ ভাবে, "বাইশ বৎসর পূর্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা

নির্ধারিত হয় ; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।”

“বৈজ্ঞানিক-সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতুনির্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।”

বিজ্ঞান-মন্দির গৃহের রূপায়ণে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মানসলোকের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। গবেষণাগার গৃহ নির্মিত হয়েছে ধূসর বেলেপাথর দিয়ে। মৌর্যযুগ ভারতের ইতিহাসে মানব সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। সে সময়ে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প ও ধর্ম-সংস্কারে যেমন উল্লেখযোগ্য ছিল, তেমনি স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভাবন ও নির্মাণেও ছিল নিপুণ। সে সময়ে মন্দির-স্থাপত্যে ব্যবহৃত হত এই ধূসর বেলেপাথর। জগদীশচন্দ্র ভারতের সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক কালের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতেই যেন বিশেষ করে এই পাথর দিয়ে বিজ্ঞান-মন্দির গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশপথের পাশে একটি ছোট উদ্যান। লজ্জাবতী-লতার মতো সংবেদনশীল দেশীয় নানা উদ্ভিদ সে উদ্যানে। একটি ছোট পুকুর আর একটি ফোয়ারাও আছে সে উদ্যানের মধ্যে। এই ফোয়ারার মাথায় এক নারীমূর্তি। তাঁর হাতে প্রদীপ। ভঙ্গিটি এ রকম—তিনি যেন প্রদীপটি মন্দিরে নিয়ে চলেছেন। মন্দিরের দরজা পেরিয়ে প্রথম যে কক্ষ তাতে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে। এর পরেই বক্তৃতামণ্ডপ। তার একদিকে বক্তৃতা-মঞ্চ। মঞ্চের পেছনের দেয়ালের উপর দিকে শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা চিত্র। চিত্রের নাম ‘অন্বেষণ’। তরবারি হাতে এক বীর পুরুষ, তার সঙ্গে বাঁশি হাতে এক উজ্জ্বল নারী—শক্তি এবং প্রজ্ঞার রূপক। এ ছবির নীচে সোনা-রূপা-তামায় খোদিত সূর্য-দেবতা—সাত ঘোড়ার রথে চড়ে তিনি চলেছেন অন্ধকার দূর করে, চারদিক হয়ে উঠছে আলোকে উদ্ভাসিত। এ ছবির ব্যঞ্জনা

হল, জ্ঞানের আলোয় অজ্ঞানতা বিলীন করা। এ চিত্রটি অজন্তা গুহামন্দিরে দেখেছিলেন জগদীশচন্দ্র। মানুষের মুক্তির জন্যে সম্রাট অশোক একটি আমলকির অর্ধেক মাত্র সম্বল রেখে তাঁর রাজত্ব, তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর যাবতীয় জাগতিক সম্পদ-সম্মান ত্যাগ করেছিলেন। তাই একটি আমলকির অর্ধেকের চিত্র ভারতীয়দের কাছে মানুষের জন্যে সব কিছু ত্যাগের প্রতীক। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-মন্দির-গৃহের দেয়াল এবং স্তম্ভ এই প্রতীক চিহ্ন দিয়ে অলংকৃত করেছেন। মন্দিরের মাথায় শোভা পাচ্ছে একটি বজ্র। এটিই এ মন্দিরের ধ্বজা। এই বজ্রচিহ্নিত ধ্বজা স্মরণ করিয়ে দেয় দধীচির আত্মত্যাগ। ধরাতলের বিনাশ রোধ করতে ইন্দ্র যে বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুরকে নিপাত করেন সেটি তৈরী হয়েছিল দধীচির অস্থি দিয়ে। মহৎ কাজে নিজের জীবন উৎসর্গের এই পবিত্র দৃষ্টান্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের মানুষকে জনহিতের জন্যে আত্মত্যাগে প্রেরণা দিয়েছে। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরের শীর্ষে সেই আত্মত্যাগের বজ্র-চিহ্ন স্থাপন করেছেন। বিজ্ঞান-মন্দিরের পেছনেও একটি উদ্যান রচিত হয়েছিল। সে উদ্যানে একটি কৃত্রিম নদীর ওপরে একটি সেতুও ছিল। বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পবোধ ও কবিস্বভাব একত্র হয়েছে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মানসে। তিনি বলেছেন, "বিজ্ঞান যেমন সত্য, সৌন্দর্যও তেমনি সত্য। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে।"

১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র যখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র, তখন তাঁর দিনপঞ্জিতে (৫ই মার্চ, রবিবার) লিখেছিলেন,—

"বিষুব অঞ্চলে যে অফুরন্ত সৌরশক্তি নষ্ট হয় তা কোন উপায়ে কাজে লাগানো যায় কিনা, তাহা লইয়া আমি অনেক দিন ধরিয়াই ভাবিতেছি। অবশ্য গাছপালা সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়। কিন্তু এই প্রবহমান সৌরশক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাবার কি অন্য উপায় নাই? তাপশক্তির প্রয়োগে উদ্ভূত ফলাফলকে কাজে লাগাইবার সৌর এঞ্জিন (যাহা একটি তাপ এঞ্জিন ছাড়া কিছুই নহে) তৈরী করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যে-কোন সংযোগস্থলে তাপ প্রয়োগ করিয়া আমরা তাপ-বৈদ্যুতিক প্রবাহও লইতে পারি। কিন্তু এ রকম তাপ-বৈদ্যুতিক ব্যাটারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই লাগে না। প্রচুর

শক্তিও পরিবহণের সময় নষ্ট হয়। এখন আমার চিন্তা সৌর শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে কিনা!

"ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যকিরণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বিশ্লিষ্ট করিয়া কার্বন জমা করে এবং এর ফলে Kinetic Energy পরিণত হয় Potential Energy-তে। এই রাসায়নিক ভাঙ্গাগড়ার প্রক্রিয়ায় লাল-হলুদ-রং-এর সূর্যরশ্মি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

"ধরা যাউক, ভাঙ্গার জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া গেল না। তাহা হইলে শোষিত সৌরশক্তি, কি রূপ লইয়া নির্গত হইবে? সম্ভবত তাপশক্তি-রূপে। কিন্তু শোষিত সূর্যশক্তি হইতে আমরা কি বৈদ্যুতিক শক্তি পাইতে পারি?"

জগদীশচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই এ চিন্তা করেছেন ভাবতে অবাক লাগে। ছাত্র জগদীশের দিনপঞ্জির পাতাটির বক্তব্যে একজন পরিণত বিজ্ঞানীর মনের ছাপ পড়েছে দেখা যাচ্ছে। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিজ্ঞান নিয়ে এমন ভাবে অনুভাবিত ছিলেন যে, ধীরে ধীরে তাঁর সে অনুভাবনার পরিণতিতে এক ব্যাপক বিজ্ঞান-মানস গড়ে উঠেছিল।

সমকালীন সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞান-গবেষণা বা আবিষ্কার সম্পর্কে অতশত বুঝুক বা না বুঝুক, জগদীশচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটি, তাঁর এই ব্যাপক বিজ্ঞান-চেতনাসম্পন্ন মানসপটের স্বরূপটি লক্ষ্য করে অভিভূত হয়েছিল। হবারই কথা। কেননা, জগদীশচন্দ্র ইচ্ছে করলেই দেশের গণ্ডীর বাইরে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়া থেকে বিচ্ছিন্ন উপর তলার সুখ-সম্মান-সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন। তাতে বলারও ছিল না কিছু। কিন্তু তিনি তা তো কেবল উপেক্ষাই করেন নি, উপরন্তু নিজের মানসকে পূর্ণ রূপে রূপায়িত করার জন্যে নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তাই এ ত্যাগী যখন দেশের মানুষের কাছে হাত পেতে দাঁড়ালেন—বিজ্ঞান-মন্দির স্থাপনের জন্যে অর্থের অভাব হল না। তখনকার পরাধীন ভারতের হতশ্রী দীন-দরিদ্র মানব-সমাজের পক্ষেও এ এক গৌরব-জনক অধ্যায়—তাঁরা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন জগদীশচন্দ্র তাঁদেরই লোক, তাঁদেরই হৃদ্‌স্পন্দনের অংশভাগী।

আর তাও সম্ভব হয়েছিল তাঁর বিজ্ঞান-মানসের অখণ্ড সুবিস্তারের জন্য। তা কোনও সংকীর্ণ বিজ্ঞান-গণ্ডীতে নিবদ্ধ ছিল না বলেই, সেখানে নির্মোহ বিজ্ঞান-সাধনার একটি সুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তিনি। আজ বসু বিজ্ঞান-মন্দির আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞান-গবেষণা কেন্দ্র বলে সুবিদিত। তার সাচ্ছল্যও অপরিমিত। কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে এ দুটি বিষয়েই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁর মানসপটের রূপটি শেষ পর্যন্ত বাস্তব অবস্থায় অম্লান উজ্জ্বল থাকবে কিনা এবং তার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে কিনা—এক সময় এই ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মানসে একটি আন্তরিক ভারতীয় চেতনার লক্ষণ স্পষ্ট ছিল, তাই ফুটেছে বিজ্ঞান-মন্দির উৎসর্গের বাণীতে। বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের উৎসর্গ ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে,—

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান মন্দির
দেব-চরণে নিবেদন করিলাম।
শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
১৪ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪।

ভারত কোনদিনই কেবল নিজের কথা ভাবে নি, কেবল নিজেরই ভোগে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-ভাস্কর্য নিয়োজিত করে নি। বিশ্বমানবের মঙ্গল চিরকালই ভারতের সাধনার অঙ্গ ছিল। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দির উৎসর্গের বাণীতেও দেখছি ভারতের গৌরব এবং জগতের কল্যাণ কামনাই তাঁর বিজ্ঞান-মানস প্রকৃতিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তাঁরও গৌরব এখানেই—জগতের শুভ বোধে, জগতের কল্যাণ কামনায়।

সাহিত্য-চেতনা

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী। অথচ তাঁর একমাত্র বাংলা রচনা-সংকলন গ্রন্থ 'অব্যক্ত' পাঠ করলে ছত্রে ছত্রে তাঁর সাহিত্য-চেতনা এবং ভাষা-

শৈলীর প্রকাশ অবাক করে। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই বিজ্ঞান বিষয়ে। দু'-একটি বিজ্ঞানের বাইরের বিষয়ে হলেও তাঁর বিজ্ঞান-প্রবণতা তাতে সজাগ।

'পলাতক তুফান' একটি গল্প। কিন্তু বিজ্ঞানের আশ্রয়ে গল্পটির প্রকাশ লক্ষ্য করার মত। এ গল্পটির জন্য ১৩০৩ বাংলা সালে কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। আর একটি কাহিনী 'অগ্নিপরীক্ষা' নেপালের ইতিহাস আশ্রয় করে রচিত, মূল উপাদান দেশপ্রেম। 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' অপর একটি সুপরিচিত রচনা। এ রচনায়, 'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? মহাদেবের জটা হইতে।'—এই জিজ্ঞাসা ও উত্তর সমন্বিত বাক্যটি বাংলা ভাষায় এখন প্রবাদবাক্যের মতো। এটি ভ্রমণ-কাহিনী পর্যায়ের হলেও কেবলমাত্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নয়, বিজ্ঞান-চেতনা থেকে এক দার্শনিকতায় উত্তরণই বলা যায় এ কাহিনীর মূল বিষয়।

'বিজ্ঞানে সাহিত্য' রচনাটি পাঠ করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, আসলে সাহিত্য, কাব্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক বোধ কত প্রখর এবং অনুভূতিশীল। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে।'

সারা জীবন বিজ্ঞান সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন জগদীশ-চন্দ্র, প্রকৃতি জগতের যে অনাবিষ্কৃত অধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন—রসজ্ঞ এবং নিপুণ সাহিত্যিকের মতো ভাষায় তা প্রকাশ করেছেন। মনে হয় না, একজন বিজ্ঞানী লিখেছেন এসব। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণার কথা জগদীশচন্দ্রের আগে কেউ সাহিত্যবোধে সমৃদ্ধ করতে পারেন নি। বিজ্ঞান-বিষয়ে সেকালে অধিকাংশ রচনাই ছিল তথ্যনির্ভর ঘটনার বিন্যাস মাত্র।

সাহিত্যের দিকে তাঁর অনুরাগ স্পষ্ট প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বে। রবীন্দ্রনাথের কিছু রচনা, কবিতা এবং গল্প, নিজে অনুবাদ করে বিলাতের কাগজে প্রকাশ করেছিলেন। সে কেবল বন্ধুর প্রতি অনুরাগের জন্যে মনে করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্পে যে বিশ্বমানবতার বোধ প্রকাশ পেয়েছে, তা ভারতের একান্ত নিজস্ব প্রাচীন-চেতনারই আধুনিক প্রকাশ। আর তাই

ছিল জগদীশচন্দ্রের মতো একজন বিজ্ঞানীর কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। কেননা, তিনি নিজে ছিলেন আধুনিক ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার পথিকৃৎ, আর বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের বাণী-সাধকের নবীন প্রাণধর্মের প্রকাশ।

বিজ্ঞান এবং সাহিত্যকে তিনি আলাদা করে দেখেন নি। তিনি এই দুই বিষয়কে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবেই দেখেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্য-সাধনা এবং বিজ্ঞান-সাধনার মূল লক্ষ্য একই—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন, এবং অনাবিষ্কৃত রূপের আবিষ্কার করে মানুষের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত করা। তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থে বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্য মিলে মিশে যে অসাধারণ রূপ লাভ করেছে তাতে মনে হয়, সাহিত্য-চেতনাতে সে যুগে তিনি অনেকের চেয়েই এক পা এগিয়ে ছিলেন।

ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থ মোট চৌদ্দটি। বিদেশের বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত সমাজ তাঁর সেসব গ্রন্থ সম্পর্কে বহু প্রশংসা করেছেন। ইংরেজিতে তাঁর গবেষণা-তথ্য প্রকাশের ভাষাও প্রায় ক্ষেত্রেই সাহিত্য-রসে ভরপূর। যার জন্যে তাঁর গবেষণা-গ্রন্থগুলো বিজ্ঞানী-মহলের বাইরেও সমাদর পেয়েছে।

স্বাদেশিকতা

"গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উত্তাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল? কেবল গাছের গুণে নয়! আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বজাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত।" —রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত এই অংশে তাঁর স্বাদেশিকতার মূল সুরটি বোঝা যায়।

তিনি রাজনীতিবিদ ছিলেন না, রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহও ছিল না। তাই তাঁর সময়ের রাজনৈতিক উত্তাল তরঙ্গ বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে তাঁকে সক্রিয় কোনও ভূমিকায় দেখা যায় নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অতি সহজেই সে আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিলেন। অথচ দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতা ছিল গভীর। মনে হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে

জগদীশচন্দ্রকেও রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা দেখা যায় নি। এতে অস্বাভাবিক তেমন কিছু নেই।

জগদীশচন্দ্র রাজনীতি ও মুক্তি আন্দোলনের বাইরে ভারতের গৌরব পুনরুদ্ধারের কথা ভেবেছেন অন্য পথে। সে পথ বিজ্ঞান সাধনার পথ। সারা বিশ্বে একদিন বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতের অবদান কম ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে সে দিন গত হয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খলে ভারতের দুর্দশা দেখা দিল। ভারতের মানুষ ভুলে গেল, তাদেরও একটা সুমহান ঐতিহ্যময় ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস থেকে নিজেদের অনুপ্রেরিত করে আধুনিক জগতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, এটা বুঝেছিলেন জগদীশচন্দ্র। রাজনীতি থেকে কিছুটা ব্যবধানে এ পথে চলে লক্ষ্যে পৌঁছানো অনেক বেশি দুরূহ কাজ। তবু সেই দুরূহ কঠিন কাজকেই নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র।

বিজ্ঞান-সাধনা তাঁর জীবিকা ছিল না। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অপর পিঠ হিসেবে তাঁর এ সাধনাকে ধরা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ পথিক। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর সিদ্ধি বা ব্যর্থতা ভারতের কত গভীরের ব্যাপার। তাই জগদীশচন্দ্রের সাধনার পথকে অবাধ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন আন্তরিক ভাবে।

প্রথম জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার সময়ে সাহেব অধ্যাপক আর ভারতীয় অধ্যাপকের বেতন-বৈষম্যের নীতির বিরুদ্ধে তাঁর যে দৃঢ় প্রতিবাদ, তা নেহাৎ আর্থিক পরিমাণের তারতম্যের জন্যে নয়। তাঁর কাছে তা ছিল ভারতীয়দের একান্ত মর্যাদার প্রশ্ন। তাঁর সময়ে বা তাঁর আগেও বহু ভারতীয় অধ্যাপকই ইংরেজের এই হেয় ভেদনীতি মেনে নিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন নি, মর্যাদার কথাও কারো মনে হয় নি। জগদীশচন্দ্র সে ক্ষেত্রেও একা এবং অদ্বিতীয়। দীর্ঘ তিন বছর বেতন প্রত্যাখ্যান করে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে চলতে হয়েছে। সে সময়ে তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্রও ঋণভারে জর্জর, অবসর-প্রাপ্ত। পারিবারিক দুর্দশা মেনে নিয়েছেন তিনি, কিন্তু মাথা নোয়ান নি পরদেশী শাসকের দুর্নীতির কাছে। একে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধের পটে আঁকা যায় না। বলা যায়, তাঁর স্বদেশের,

স্বদেশীয়ের মর্যাদার প্রশ্নেই তিনি এর প্রতিবাদ নিজের কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁর একক প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত সরকারী রীতির পরিবর্তন হয়েছিল।

ছেলেবেলায়, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে একনিষ্ঠ জনসেবা ও দেশ-প্রীতির আদর্শ দেখেছেন পিতার চরিত্রে। মায়ের চরিত্রে দেখেছেন নীরব স্নেহ-মমতার পবিত্র প্রতিরূপ। স্ত্রী অবলা বসুর সাহচর্যে লক্ষ্য করেছেন অপূর্ব কর্মনিষ্ঠা। ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে অনুভব করেছেন মানবপ্রীতি। তা ছাড়া, সে সময়ের পরিমণ্ডলে ভারতীয় এবং ইংরেজ এই দুই মানব সমাজের মধ্যে স্পষ্ট দেখেছেন এক ধরনের বৈষম্যবোধ। এসব তাঁর চরিত্রে এক দৃঢ়চেতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানবিকতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে তাঁর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। এই যুগন্ধর দুই প্রতিভার ভাব-বিনিময়ের মধ্যে যে চরিত্র ফুটে উঠতে দেখেছি আমরা, তাকে প্রথমত, স্বাদেশিকতা বললেও সে স্বাদেশিকতা সর্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত—বিশেষ কোনও দেশ-কালের গণ্ডীতে তাকে সীমিত করা যায় না।

তাঁর সমকালীন বিবেকানন্দের মানবিক ধর্মবোধ, মহাত্মা গান্ধীর মানবতার রাজনীতিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়। কিন্তু ধর্মে বা রাজনীতিতে কোন সক্রিয় ভূমিকা নেবার কথা না ভেবে, সেসব আদর্শের অনুপ্রেরণায় তাঁর নিজস্ব কর্মভূমি বিজ্ঞানের গবেষণা প্রশস্ত করতে নিজেকে দৃঢ়বদ্ধ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র। কোনও ব্যক্তিগত যশ-খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। গবেষণা-লব্ধ সত্যে উপনীত হয়ে, নানাবিধ যন্ত্র উদ্ভাবন করেও তিনি সে দিকে উদাসীন—এটাই দেখা গেছে সারাজীবন। তাঁর এ উদাসীনতা একদিকে যেমন আত্মত্যাগের চরিত্র, অপরদিকে স্বদেশের প্রাচীন বিশ্বমানবতাবোধের মহিমা বিকশিত করেছে। মানব সমাজে একজনের কর্মপ্রচেষ্টা বহুজনের হিতের জন্যে না হলে মানবতার সার্থকতা কোথায়? এ বোধ বা জ্ঞান ভারতের প্রাচীন সভ্যতার দান। প্রাচীন ভারতে যে দর্শন ও বিজ্ঞান বোধ সারা বিশ্বের মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে সেই একই দর্শনও বিজ্ঞান বোধে জগদীশচন্দ্র নিজেকে উদ্বোধিত করেছিলেন। নিজের

যাবতীয় জ্ঞান-গবেষণা তাই বিশ্ব-মানবকেই উৎসর্গ করেছেন। এ-ও স্বাদেশিকতার এক উদারতম দিক্ এবং মহত্তম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে আছে, "তুমি ত এতদিন নির্জনে সাধনা করিয়াছে, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখদুঃখের অতীত হওয়া যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু এ কথা সর্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, এ কথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।" স্বদেশ-চিন্তা নিয়ে এ রকম অস্থিরতা অনুভব করেছেন সর্বক্ষণ। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সফলতা বা বিফলতা যে নিজের দেশের নামের সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত, সে বোধ থেকে কোনদিনই চ্যুত হন নি জগদীশচন্দ্র। তিনি স্বদেশীয় বন্ধুজনের আগ্রহ-উৎসাহের মধ্যে নিজ-মাতৃভূমির বাণী শুনেছেন, মাতৃভূমির মর্ম অনুভব করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তোমাদের উৎসাহ-বাণীতে মাতৃস্বর শুনিলাম। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসন পরিহিতা মূর্তি সর্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই।" শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার পরে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই ভূমির জন্যই আমাদের দেহমন যেন পর্যবসিত হয়। ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার নাই। তোমাদের আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এইভাব লইয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া নিয়োজিত কার্য করিতে পারে। তারপর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

"তুমি যাহার সূত্রপাত করিয়াছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ—ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ-দুঃখ আমরাই বহন করিব। যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর, তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। অন্তরে কিংবা বাহিরে প্রতারণার দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্ট লাভ করিব না।"

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, জাতিভেদ প্রথা, এসব যে আমাদের জাতীয় অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের ফল তা নিয়েও সময় বিশেষে তিনি তাঁর

ধারণার কথা প্রকাশ করেছেন। বিক্রমপুর সম্মেলনে তাঁর ভাষণটি এ বিষয়ে স্মরণীয়। এই ভাষণ 'বোধন' নামে 'অব্যক্ত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, ছেলেবেলায় তাঁর সহপাঠী সঙ্গী ছিল তাঁর বাবার মুসলমান চাপরাশির ছেলে, জেলের ছেলে, প্রচলিতার্থে অস্পৃশ্য বিধর্মী ও নিচু জাতের সন্তানেরা। তাঁদের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে এরা আসা-যাওয়া করতো। তাঁর মা তাঁর সঙ্গে তাঁদেরও একত্রে খাবার দিতেন, আদর করতেন। তিনি বলেছেন, এ সবের জন্যে তাঁদের পারিবারিক জীবনে নিষ্ঠাবান হিন্দু রীতি-নীতির কোনও ব্যাঘাত ঘটতে দেখেন নি তিনি। তাঁর পরিবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ করার সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি কখনও অনুভব করেন নি যে, হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের কোন প্রভেদ আছে, বুঝতে পারেন নি উঁচু জাতের মানুষের চেয়ে নিচু জাতের মানুষ নিকৃষ্ট। প্রসঙ্গক্রমে তাই এসব বাতুলতা ত্যাগ করে কর্ম-সাধনের কথা বলেছেন। বলেছেন, "জীবন-সংগ্রামে যে কেবল শক্তি-মানই জীবিত থাকে, দুর্বল নির্মূল হয়, এ কথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য মনে করিতাম। কিন্তু পৃথিবী-ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্বল উচ্ছিন্ন হইবে এবং সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে।" দুর্বল মানব-সমাজ বাঁচবে কি নিয়ে? জাতি, ধর্ম, শ্রেণী এ সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডী যে-মানব সমাজকে নানা রকমে বদ্ধ ও দুর্বল করে রাখছে তাঁর বাঁচার পথ কোথায়? "অহিফেন সেবনে অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীত গৌরব স্মরণই আমাদের পক্ষে বর্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতি-যোগিতায় উচ্ছিন্ন হইতেছে, এসব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোনো তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোনো সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন, তাহা সর্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে ; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজেকে জাগ্রত রাখো।"

আমাদের সমাজের অবহেলিত অস্পৃশ্য নিম্নশ্রেণীর সম্পর্কে

উদাসীনতা, অনাগ্রহ এবং অজ্ঞানতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে ? এই বিস্তৃত রাজ্য রক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন করিতেছে ? তাহা জানিতে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন করো। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্ধ-নিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই ; কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

দেশের শিক্ষা, শিল্প, স্বনির্ভরতা নিয়েও তাঁর ধারণা এবং অভিমত স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন উপলক্ষে। তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ভাবাবেগে ঝাপসা কোনও কল্পনা তাঁর নেই। বাস্তব-নির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা যুক্তিযুক্ত মনে হবে তাতে লেগে না থাকলে দেশের এবং দশের মুক্তি নেই। শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে বলেছেন, "কেহ কেহ মনে করেন যে, সরকারী এক জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টর মহোদয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নহেন। এই সমস্ত গুণের সমন্বয়েও বিধাতা-পুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয়, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে যাহাতে আমরা একান্ত বিমুখ।··· আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি ? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' এ কথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি।"

"শিল্পের উন্নতির আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহার ঠিক সেইমত কারখানা এ দেশের ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহু বৎসর পরে যদি বা তাহা কোনো প্রকারে কার্যকরী হয় তাহা হইলেও এতদিনে পূর্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে। কোনোদিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা

বর্ধিত হইবে না, যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন ?"

যে মানুষ সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছেন 'বেতার-সংকেত প্রেরণ' আবিষ্কার করে, জড়-জীব-উদ্ভিদের সাদৃশ্য উন্মোচন করে, আর উদ্ভিদের প্রাণক্রিয়ার রহস্য বিশ্লেষণ করে, তিনি যদি উক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করতেন তাতে কারো কিছু মনে হত না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ওসব ব্যাপারে নিজের একটা দায়বোধ, কর্তব্যের সাড়া তীব্র ভাবে তাঁকে আলোড়িত করেছে। তাই বিজ্ঞানে তাঁর অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের বাইরেও আর একটা বড় বিষয় রয়েছে, তা তাঁর দেশ, দেশের মানুষ, দেশের মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-কর্মপন্থা।

ইংল্যাণ্ডে থেকে বিজ্ঞান-চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার আহ্বান পেয়েছেন। তাতে তাঁর গবেষণার বহু সুবিধা হত। আর্থিক সংস্থানও ঘটে যেত দেশের চেয়ে বহু গুণে বেশি। কিন্তু সে সুযোগ তিনি অনায়াসে ঠেলে ফেলেছেন। কারণ একটাই, মাতৃভূমি ভারতের গৌরব তাতে ক্ষুণ্ন হয়। তাঁর কাছে, নিজের দেশের বাইরে, বিদেশের অনুগ্রহে নিজের প্রতিষ্ঠা শুধু অগৌরবের নয়, অকৃতজ্ঞতারও স্মারক। তিনি বলেছেন, "যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

"তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিব ? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে ? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না ? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশ-দেশান্তর

হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত।
তক্ষশীলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর
শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ নাই? অজ্ঞ হিন্দু রমণী
কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। জ্ঞান-
মন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব?

"মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহু স্থানে বিশাল বৌদ্ধ-বিহার
স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞানই যে ভেদ সৃষ্টির মূল এবং তোমাতে
আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা
লাভ করিয়াছে। আমাদের এই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান ও
সেবার দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবে না?"

দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কার সম্পর্কেও তাঁর অভিমত অত্যন্ত
বাস্তব প্রসূত। এ নিয়েও তিনি ভেবেছেন। তাঁর সে ভাবনা
হয়তো অধ্যাপনা জীবনের শুরুতেই ছিল। কেননা, তাঁর অধ্যাপনার
ধারাটি ছিল একান্তই তাঁর নিজস্ব। সেকালে ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে
চিরাচরিত প্রথার বাইরে যাবার কথা কেউ ভাবেন নি। জগদীশচন্দ্রই
বোধ হয় সে ব্যক্তি যিনি বিদেশের অনুকরণে নয়, জ্ঞানের অনুসরণে
শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ণয়ের কথা ভেবেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে
ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এ এক ভাষণে বলেছিলেন,
"পাঠ্য তালিকাকে আরও সহজ করে পুঁথিগত তথ্য আবৃত্তির বদলে
পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণকে অধ্যাপনার মাধ্যম করতে হবে।" অন্যত্র
আমাদের শিক্ষাপ্রণালী প্রসঙ্গে বলেন, "প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার
করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই।......বিজ্ঞানের
কূটতত্ত্ব ও কঠিন সমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি
বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে
শেখাই বিজ্ঞান-সাধনার মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞান-পাণ্ডিত্যে যাঁহারা
যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া
বড় হইয়াছেন তাহা নহে। আমাদের দেশে আমরা যদি যথার্থ
বিজ্ঞান-বীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ আরও
দুরূহ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার জন্য
দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই এবং ছাত্রেরা
যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যার শুষ্ক কাঠিন্যের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া

প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিজ্ঞান-দৃষ্টি চালানোর চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।”

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানী হলেও তাঁর দৃষ্টি দেশের সার্বিক উন্নয়নের দিকে কেবল অঙ্গুলী নির্দেশ করেই দায় সারে নি। কি করলে সমস্যা থেকে উৎরে আসা যাবে, কোন পথে দেশের উন্নতি হবে, সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তিসঙ্গত ভাবনা এবং প্রয়াস ছিল সারা জীবন। বিজ্ঞান-মন্দির পরিকল্পনার পেছনেও তাঁর স্বদেশ-ভাবনা ছিল জাগ্রত। আমাদের দেশেও যাতে বিজ্ঞানের অধুনাতন বিষয়ের উপর গবেষণা করা যায়, বিজ্ঞান-মন্দিরে কর্মসূছী নির্বারণের সময় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে তুলেছেন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে শিক্ষাশ্রম। আর জগদীশচন্দ্র নির্মাণ করেছেন পৃথিবীর অন্যতম শহর কলকাতার কেন্দ্রে বিজ্ঞান-মন্দির। দেব-উপাসনার মন্দির নয়, বিজ্ঞান-সাধনার পীঠস্থান আধুনিক বিজ্ঞানের অপরিমেয় সম্ভাবনার সন্ধানে এগিয়ে যাবার, গবেষণাগার। নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে সর্বত্যাগী ঋষির মতো জগদীশচন্দ্র দেশের সন্তানদের বিজ্ঞান-সাধনার জন্যে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন তা স্বদেশ-ভাবনার স্বাভাবিক পরিণতিরই ফল। নিছক বিজ্ঞান-গবেষণার গণ্ডীতে তাকে ফেলা যায় না।

উদ্ভিদ-জীবন নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন ব্যাপকভাবে। সে গবেষণায় কেবলমাত্র উদ্ভিদের জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করেই তিনি তুষ্ট থাকেন নি। গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান যাতে দেশের কাজে লাগে সেদিকেও তাঁর নজর ছিল সজাগ। দেশের কৃষি-উন্নয়নে যাতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্যকরী হয় তারও বাস্তব উপায় নির্দেশ করেছেন তিনি।

তাঁর স্বাদেশিকতার কোন অবস্থাতেই ভাবাবেগ মাত্র সম্বল ছিল না। নিজে বিজ্ঞানী। তাঁর সব ভাবনা সব কল্পনার পেছনে কাজ করেছে বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিনির্ভর কর্মপ্রবণতা। তাই দেখা যায়, সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী, উন্নতশির।

দেশকে ভালবেসেছেন। সে ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না, প্রতিদান পাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নিজেকে উজার করে বিলিয়ে

দিয়েছেন দেশমাতৃকার পায়ে। তাঁর জ্ঞান, তাঁর গুণ, তাঁর আবিষ্কার, তাঁর গবেষণা, তার প্রাণ-মন-সাধ-সাধনা সবই দেশের জন্যে উৎসর্গ করেছেন। তাই তাঁর আসনটি পাতা রয়েছে দেশের মানুষের হৃদয়ের গভীরে। অথচ দেশের জন্যে যথাসর্বস্ব ত্যাগ না করলেও মহাবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে কে অস্বীকার করতে পারতো? ইতিহাসের পাতায়, দেশের গুণীজনদের পঙ্‌ক্তিতে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকতো নিশ্চিত। সে স্বর্ণোজ্জ্বল নাম মানুষকে মুগ্ধ করতো, কিন্তু সর্বকালের মানবহৃদয়ে আপনজনের জন্যে যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসনটি পাতা থাকে তা তিনি পেতেন না।

তাঁর বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা-দিবসের ভাষণে এক জায়গায় বলেছেন, "বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য কোনোদিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণও এদেশে কোনোদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে।"

তাঁর এ বোধ জীবনের প্রথম পর্যায়েই জেগে উঠেছিল। তাই জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই এক অনমনীয় স্বাতন্ত্র্য তাঁকে কঠিন সাধনায় ব্রতী করেছে। এবং সে ব্রতের প্রধান মন্ত্রই ছিল ভারতের গৌরব সাধন। জীবনে যা কিছু করেছেন সবই ভারতকে আবার গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, ভারতের দুর্নাম মোচনের জন্য। তাঁর কৃতকর্মের সুফল সবই তিনি ভারতের নামে উৎসর্গ করেছেন। যেন সর্বত্যাগী ঋষি—সৌম্য শান্ত শাশ্বত। জগদীশচন্দ্র ভারতের অম্লান, অবিনশ্বর চিরন্তন প্রেরণা।

বিদ্যুতের রূপকথা

—অজয় চক্রবর্তী

বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার আজ সহজ এবং স্বাভাবিক। আজকের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিস্তার এবং প্রভাব। আধুনিক সভ্যতার অভাবিত উন্নতির মূলেও রয়েছে বিদ্যুতের বিচিত্র অবদান। কিন্তু এই শক্তিটির সন্ধান খুব সহজে পায় নি মানুষ। দীর্ঘকাল ধরে এর অনুসন্ধান, তিলে তিলে এর প্রকৃতি অনুধাবন, ক্রমে ক্রমে একে মানুষের নানা কাজে লাগাবার ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি অভাবিত। তা অবাস্তব রূপকথাকেও বোধ হয় হার মানায়। বিদ্যুৎ আবিষ্কার এবং তার প্রয়োগের আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা অনবদ্য কাহিনীর আকারে লিখেছেন লেখক। বইটি পড়তে শুরু করে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না লেখার মুন্সীয়ানায়। একাধারে এ হল বিদ্যুতের সম্পুর্ণ ইতিহাস, আবার তার পেছনে যে সব মানুষের সাধনা জড়িয়ে রয়েছে তাদের জীবন-কাহিনী এবং সাধারণ পাঠক ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের শিক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু সবটাই এমন উপভোগ্যভাবে পরিবেশিত যে মনেই হবে না সত্য ঘটনা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জটিল তথ্য বা তত্ত্ব। রূপকথার আমেজে এ এক অপরূপ বাস্তবের কথা।